বাতায়ন
পুজোর আমেজ

শক্তি রূপেণ

বাতায়ন

পঞ্চম সংখ্যা, অক্টোবর, ২০১৬

সম্পাদনা
রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

EDITORS
Ranjita Chattopadhyay, Chicago, IL
Jill Charles, IL, USA

COORDINATOR
Biswajit Matilal, Kolkata, India

DESIGN AND ART LAYOUT
Kajal & Subrata, Kolkata, India

PHOTOGRAPHY
Tirthankar Banerjee, Perth, Australia

PUBLISHED BY
Neo Spectrum
Anusri Banerjee, Perth, Australia
E-mail: a_banerjee@iinet.net.au

Our heartfelt thanks to all our contributors and readers for overwhelming support and response. We wish you all a happy festive season and enjoy our fifth issue of **"BATAYAN"**.

বাতায়ন পত্রিকা বাতায়ন কমিটি দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত । বাতায়ন কমিটির লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ । রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ ।

Published by the BATAYAN of Neo Spectrum, Perth, Australia. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

সূচীপত্র

বাংলার প্রথম মহিলা মৃৎশিল্পী : মায়ের হাতেই মাতৃ আরাধনা	বিশাখা দত্ত	1
শ্রদ্ধাঞ্জলি	সুজয় দত্ত	3
উড়ো কাগজের টুক্‌রো	রমা জোয়ারদার	7
বাইশে শ্রাবণ	আনন্দ সেন	10
তারিণী মামা	নন্দিতা রায়	11
সাম্বার দেশে পঞ্চবলয়	সুজয় দত্ত	14
লিমেরিক	শুভ্র দত্ত	17
একটি প্রহর	মহম্মদ শাহরিয়ার	18
I Cannot Live Without Books	Rochelle George Wooding	20
Agatha Christie: Queen of Mystery	Jill Charles	21
Mahishasura	Souvik Dutta	22
Communication of the Self	Allen F. McNair	24
You and I	Balarka Banerjee	25
City of Constellations, City of River Light	Viola Lee	26
We Are All Related	Lew Rosenbaum	27
RIGOLETTO: The Curse	Tinamaria Penn	30
Love Poem Posted on the Internet	M.C. Rydel	31
To Grandmother's House	Shreya Datta (11th Grade)	32
NORTH SEA JAZZ	Maureen Peifer	33
Lightening After the Echo	Jill Charles	34
Annual Great Southern Festivalgoer and Wine Lover	Erin Nichols	35

সম্পাদকীয়

পুজোর আমেজ

পুজো আসছে। পৃথিবীর যেখানে যে বাঙালীই আছে তার মন খুশীতে নেচে ওঠে এই দুটো শব্দে। বার মাসে তের পার্ব্বণের দেশে এই পুজোর তাৎপর্য্য সুগভীর। বাঙালী জীবনের নানা দিক ছুঁয়ে যায় এই উৎসব। এ হল বাঙালীর প্রাণের উৎসব। আকাশের নীল রঙ, এদিকে ওদিকে ভেসে থাকা সাদা মেঘের টুকরো, কাশফুলের দোলা আর ভোরের হাওয়ায় হাল্কা হিমেল ভাব বাংলার বাঙালীকে জানিয়ে দেয় মা আসছেন। তাঁকে আবাহনের আয়োজন তাই দিকে দিকে। এই মা আবার বাঙালীর ঘরের মেয়েও। হিমালয় আর মেনকার কন্যা পার্বতী শ্বশুরবাড়ী থেকে বাপের বাড়ী আসছেন চারদিনের জন্য। মেয়ের সাধ আহ্লাদ পূর্ণ হয় যাতে তার জন্য চেষ্টার ত্রুটি থাকে না উমার বাপের বাড়ীর দেশের মানুষ জনের।

উৎসব শুধু অনাবিল আনন্দের দরজাই খুলে দেয় না। সে তাকে ঘিরে থাকা নানা মানুষের জীবিকারও সংস্থান করে। পোষাক আশাকের দোকানে উপচে পড়ছে ভিড়। ভিড় মনোহারী দোকানেও। মানুষের ঢল জুতোর দোকান ছাড়িয়ে নেমেছে দোকানের সামনের রাস্তায়। দুর্গাপুজো মূলতঃ ধর্মীয় উৎসব হলেও বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনেও এই উৎসব আনে নতুন প্রাণের ছোঁওয়া। ব্যস্ততা তাই সর্বত্র। কুমোরটুলীতে প্রতিমাশিল্পীদের নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই এখন। পাড়ায় পাড়ায় চলেছে মণ্ডপসজ্জার প্রস্তুতি। কে কাকে কতখানি তাক্ লাগাতে পারে তার এক অদ্ভুত প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে আজকাল। পুজোর গান শোনার আগ্রহ নিয়ে সিডির দোকানে হাজির হচ্ছেন ক্রেতারা। নানারকম পুজোসংখ্যা সংগ্রহ করার আগ্রহও কিছু কম নেই পাঠকদের। বস্ত্র ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে প্রতিমাশিল্পী, মণ্ডপ নির্মাতা, আলোক-সজ্জাকারী, ফল, ফুল, মিষ্টির দোকানী, কাগজের হকার এবং আরও অনেকে উৎসবের এই দিনগুলোর উপর নির্ভর করে থাকেন শ্রী-সম্পদ বাড়ানোর আশায়।

অভিবাসী বাঙালীর জীবনে এই সব ভাসিয়ে দেওয়া উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠার সুযোগ নেই। কিন্তু তারাও তাদের মত করে আয়োজন করে আনন্দময়ীর আবাহনের। এ উৎসব মাত্র একটি সপ্তাহান্তের জন্যও তাদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যায়, ভুলিয়ে দেয় পরবাসের ক্ষোভ, অভিযোগ। অল্প সময়ের জন্য হলেও কঠিন জীবন সংগ্রামের তাগিদ ভোলে তারা।

পুজোকে ঘিরে নানা ভাবনা, নানা অনুভূতি। নতুন চিন্তা, নতুন আগ্রহ। সে সব আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার জন্য আমাদের ''বাতায়ন'' সবসময় খোলা। আপনাদের কাছে ছোট্ট অনুরোধ সেই খোলা বাতায়ন দিয়ে তাকিয়ে দেখতে যেন ভুলবেন না। আপনাদের জন্য আমাদের পুজোর উপহার বাতায়ন সংখ্যা 'পুজোর আমেজ'। বাঙালীর সবথেকে বড় পার্ব্বণটি কিভাবে কাটালেন, কি দেখলেন, কি পড়লেন, মায়ের কোন মূর্ত্তিটি মনে সবথেকে দাগ কাটল সে সব জানার ইচ্ছা রইল। শারদীয় উৎসব উপলক্ষ্যে আমরা সব পাঠক পাঠিকা, লেখক লেখিকা ও শুভার্থীদের শুভেচ্ছা জানাই।

ধন্যবাদসহ,

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

আজি শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও
জননী এসেছে দ্বারে।

বাংলার প্রথম মহিলা মৃৎশিল্পী : মায়ের হাতেই মাতৃ আরাধনা

বিশাখা দত্ত, Kolkata, India

ছয় নম্বর বনমালী সরকার স্ট্রীট । কুমোরটুলীতে নেমে বললাম এই ঠিকানাটা কোথায় ? একজন বলল ''এই যে সোজা গিয়ে মিষ্টির দোকানের গায়ে লাগোয়া''। আমি বললাম চায়না পালের স্টুডিও তো ? উত্তর এল হ্যাঁ । আপনি হয়তো ভাবছেন কুমোরটুলীতে হঠাৎ মহিলার খোঁজ করছি কেন ? একটু অবাক হলেও এটাই সত্যি তিনি হলেন কুমোরটুলীর একমাত্র মহিলা মৃৎশিল্পী চায়না পাল । খুঁজে হাজির হলাম তাঁর স্টুডিওতে । আলাপচারিতার মধ্যে দিয়ে জানলাম চায়না পালের শিল্পী হয়ে ওঠার কাহিনী । ছেলেবেলা থেকেই ঝোঁক ছিল আঁকা ও ছোট মাটির পুতুল তৈরীর প্রতি । ১৯৯৪ সালে চায়না পালের বাবা হেমন্ত পাল হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন । সেই সময় বাবার ব্যবসার হাল ধরতে স্টুডিওতে আসা শুরু করেন তিনি । বাবা মারা যাবার পর হাল ধরলেন পৈতৃক ব্যবসার । নানা অসহযোগীতা-প্রতিযোগীতার মধ্যে থেকেই হেমন্ত কন্যা হয়ে উঠলেন শিল্পী চায়না পাল ।

শিল্পী চায়না বাবার দেখানো পথ ধরেই শুরু করেন তার শিল্পকর্ম । একচালার টানা চোখের দুর্গাই তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য । বর্তমান কালে প্রায়শই থিম পুজোর প্রবণতা থাকলেও চায়না কিন্তু বদলাননি তাঁর মানসিকতা । সাবেকিয়ানা বজায় রেখেছেন তাঁর কাজে ।

তবুও এত বছরের কর্মজীবনে শিল্পীর মন ছুঁয়ে গেছে তাঁর তৈরী ''অর্ধনারীশ্বর'' মূর্তিটি । যদিও এটি থিমের পর্যায় পড়ে । চায়না পালের স্মরণীয় কাজ এটি । একই সাথে অর্ধেক শিব ও অর্ধেক দুর্গামূর্তি । বিগত বছরে সোনাগাছির বৃহন্নলাদের জন্যে তৈরী করেছিলেন এই মূর্তি । এছাড়া বিশেষ কোনো থিমপূজার ইদুঁর দৌড়ে সামিল না হয়ে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন চায়না ।

তাই তাঁর বাঁধা ক্রেতারা সকলেই জানেন যে চায়না পাল কেবল মাত্র এক চালার প্রতিমাই তৈরী করেন ।

কোনো প্রথাগত শিক্ষা নয়, স্টুডিওতে আসা যাওয়ার মাঝেই কেবল দেখে দেখে রপ্ত করেছিলেন প্রতিমা তৈরীর কৌশল ।

বর্তমানে তার তিনটি স্টুডিও, কুমোরটুলীতে দুটি ও গোলাবাড়িতে একটি । সব স্টুডিওতে গড়ে তোলেন একচালার দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী ইত্যাদি । রামকৃষ্ণ মিশন থেকে শুরু করে কলকাতায় বেশ কিছু বনেদী পরিবারের পুজোর মূর্তি গড়েন চায়না পাল । এরই মাঝে মাকে নিয়ে ছোট্ট সংসার । অভাব ও প্রতিকূলতার মাঝে বড়ো হয়ে উঠলেও এখন তার অবস্থা বেশ স্থিত ।

প্রতিমা তৈরীর একদম শুরুর কাজ অর্থাৎ বাঁশ কাটা, খড় বাঁধা তিনি এখন আর করেন না । মাটি দেবার পর নিপুণ হাতের কৌশল আর মাধুর্য্য মিশিয়ে তিনি সৃষ্টি করেন একের পর এক মূর্তি । তাঁর ভাষায় ''মায়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা তো এখানেই হয়ে যায়'' । সাজসজ্জার বিষয়ে তিনি

আত্মনির্ভর । শুরুতে তিনি নিজে পছন্দ করে কৃষ্ণনগর থেকে সাজসজ্জার সরঞ্জাম আনতেন, এখন প্রবল ব্যস্ততার কারণে কর্মচারীদের উপর নির্ভর করতে হয় । তাঁর তৈরী দুর্গা কখনো ৬ ফুট, কখনো ১৬ ফুট । এক হাতেই ঠাকুর বায়না, সঠিক সময় ক্রেতাদের হাতে তুলে দেওয়া এসব করতে হয় । তাই হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে শেষ মুহূর্তের ছোঁয়াটুকুই দিতে পারেন তিনি ।

শিল্পী স্বীকার করলেন দেবী দুর্গাই তাঁর প্রেরণা এই পেশায় আসার । সরস্বতী পূজার পর থেকেই শুরু হয়ে যায় দুর্গা পূজার প্রস্তুতি । মাঝে বর্ষায় বেশ কিছুদিন কাজ বন্ধ থাকে । তারই ফাঁকে সারাবছর চায়না পালের ব্যস্ততার মাঝে কাটে । বাঙালীর বারো মাসে তেরো পার্বণ । তাই বিরাম নেই তাঁর ।

কর্মজীবনের শুরুতে সহযোগীতা পাননি একদম । অনেক ক্রেতারাও ঠিকানা চেয়ে হদিশ পাননি তার । কারণ প্রতিযোগীর সংখ্যা অনেক । ভুল ঠিকানা বলে অনেকেই বিব্রত করেছেন চায়না পালের খোঁজে আসা ক্রেতাদের । হার মেনেছে শিল্পীর সবই শিল্পসত্ত্বার কাছে । এখন চায়না পাল নামে বেশীর ভাগ মানুষ একডাকে চেনেন । তাই আমারও কুমোরটুলী স্ট্রীটে গিয়ে খুঁজে পেতে অসুবিধা হয়নি ।

কাজের ফাঁকেই অবসর বের করে কখনো পুরী কখনো কাশীপুর উদ্যানবাটিতে দেবদর্শন করেছেন । বনমালী সরকার স্ট্রীটের একটি ছোট বাড়িতে বৃদ্ধা মাকে নিয়ে ব্যস্ত শিল্পীর সংসার ।

সম্প্রতি তার হাতে গড়া দুর্গা মূর্তি পাড়ি দিল লন্ডনে । হয়তো পাঁচ দিনের পূজোর উদ্দেশ্যে সে মূর্তির বিদেশ যাত্রা নয়, টেমস নদীর ধারে শহরের কোন এক সংগ্রহশালার জন্য । রাজ্যের প্রথম মহিলা শিল্পী হিসাবে পুরস্কার নিয়েছেন রাজ্যপালের কাছ থেকে ।

নিজে শিল্পী হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু মেয়েদের এই পেশায় আসা নিয়ে তিনি আশাবাদী নন । কারণ বেশ কিছু ক্ষেত্রে কায়িক শ্রমের জন্য নির্ভর করতে হয় পুরুষদের ওপর । সবশেষে বললেন স্বেচ্ছায়, ভালবেসে কেউ যদি মায়ের মূর্তি বানাতে চান নিঃসন্দেহে আসতে পারেন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চায়না পালের উত্তরসুরী হতে পারেন ।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

সুজয় দত্ত, Cleveland, USA

''আকাশভরা সূর্য তারা, বিশ্বভরা প্রাণ / তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান / বিস্ময়ে তাই জাগে, জাগে আমার গান'' আর ''মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে / আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে, ভ্রমি বিস্ময়ে'' – এক ক্ষণজন্মা স্রষ্টার লেখনী-নিঃসৃত এই অমৃতবাণী আরেক ক্ষণজন্মা গায়কের দৃপ্ত, উদাত্ত কণ্ঠস্বরে গাঁথা হয়ে রয়েছে বাঙালীর হৃদয়ে। কিন্তু এটা হয়তো অনেকেরই জানা নেই যে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের সেই ব্যতিক্রমী প্রতিভা প্রয়াত দেবব্রত বিশ্বাসের এক সুযোগ্য শিষ্য গত পাঁচ দশক ধরে তাঁর বিজ্ঞানসাধনার ব্যাপ্তিতে আর সাফল্যে বাঙালীকে করে চলেছেন গর্বিত ও বিস্মিত। আজ আমরা শুনব তাঁরই গল্প।

অথচ ষাট বছর আগে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে রসায়নশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে স্নাতক হলেন যখন, শ্রী অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় স্বপ্নেও ভাবেননি একদিন আণবিক জীববিজ্ঞানে গবেষণাই হবে তাঁর পেশা আর মানবদেহে ভাইরাস সংক্রমণের জটিল রহস্য সমাধানে তাঁর অবদান আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাবে, ভাইরোলজির পাঠ্যবইয়ে স্থান করে নেবে। রাসায়নিক (বিশেষতঃ জৈবরাসায়নিক) বিক্রিয়ার তত্ত্ব আর সমীকরণ তাঁকে চিরকালই আকৃষ্ট করত। তাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ অফ্ সায়েন্স অ্যান্ড টেক্‌নোলজিতে ভর্তি হলেন ফলিত রসায়নে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী করার জন্য। লক্ষ্য ছিল কোনো রাসায়নিক শিল্পকারখানায় বা কোম্পানীতে একটা চাকরি। সেই উদ্দেশ্যেই এম্ এস্ সির দ্বিতীয় বর্ষে সাহস করে একটা আনকোরা নতুন বিষয় নিতে চেয়েছিলেন – 'প্লাস্টিক'। তখনকার দিনে রসায়নের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই বিষয়টির জনপ্রিয়তা আর চাহিদা বেশী ছিল, কারণ এতে ভাল করলে রসায়নশিল্পের সবচেয়ে বড় নাম ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে চাকরি বাঁধা। অনেকের মতোই অমিয়বাবুও স্বপ্ন দেখতেন একদিন ঐ কোম্পানীর এক হোমরাচোমরা বড়কর্তা হবেন। কিন্তু নিয়তি খন্ডাবে কে ? ইচ্ছাপূরণ হল না তাঁর। প্লাস্টিক নিয়ে পড়ার জন্য মাত্র ছটা সীট আর মেধাতালিকায় তিনি সপ্তম। সুযোগই পেলেন না।

ইম্পিরিয়ালের স্বপ্নভঙ্গের হতাশা যখন তাঁকে গ্রাস করেছে, সেই সময় তাঁর এক অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রী অমরনাথ ভাদুড়ি (যিনি পরবর্তীকালে আমেরিকা থেকে ডক্টরেট করে দেশে ফিরে একজন প্রথিতযশা বিজ্ঞানী হিসাবে কলকাতার ইন্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট অফ কেমিক্যাল বায়োলজির কর্ণধার হয়েছিলেন) তাঁকে বললেন জৈবরসায়ন নিয়ে পড়তে। যুক্তি ছিল জৈবরসায়নে পারদর্শিতা থাকলে ভবিষ্যতে আণবিক জীববিদ্যায় সেই ধরণের গবেষণা করা যাবে যা চিকিৎসাশাস্ত্রে কাজে লাগে। অতশত না ভেবেই রাজী হলেন অমিয়বাবু। বাকিটা আজ ইতিহাস।

জৈবরসায়নে স্নাতোকোত্তর ডিগ্রী শেষ করার পর শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্যপ্রতিষ্ঠিত জৈবরসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শৈলেশ রায়ের তত্ত্বাবধানে ডক্টরেট করার সিদ্ধান্ত নিলেন। মানুষের জরায়ুমুখের ক্যান্সার-আক্রান্ত কোষকলার জৈবরাসায়নিক

বিশ্লেষণ ছিল তাঁর গবেষণার বিষয়। ১৯৬৪ সালে সেই পর্ব মেটার পর অবিলম্বেই শুরু হল তাঁর বৈজ্ঞানিক জীবনের আরেক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। পরের বছরেই নিউ ইয়র্কের ব্রংসে সুপ্রসিদ্ধ অ্যাল্‌বার্ট আইন্‌স্টাইন কলেজ অফ মেডিসিনে পোস্ট্‌ডক্টরাল ফেলোশিপ পেয়ে ডঃ জে টমাস্ অগাস্টের সহকর্মী হয়ে এদেশে এলেন তিনি। কিউ-বিটা নামক এক ব্যাক্টিরিওফাজের (এক ধরণের ভাইরাস যা ব্যাক্টিরিয়াকে সংক্রামিত করে) আত্মপ্রতিলিপি সৃষ্টির আণবিক পদ্ধতি নিয়ে ডঃ অগাস্টের গবেষণা সেই সময়ে বেশ সাড়া ফেলেছিল। তাঁর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ নিঃসন্দেহে অমিয়বাবুর জীবনের একটা মোড়-ঘোরানো ঘটনা, কারণ এর আগে অবধি আণবিক জীববিদ্যা বা ব্যাক্টিরিয়া-ভাইরাস নিয়ে তাঁর জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা ছিল সামান্যই। ব্রংসের গবেষণাগারে তাঁর প্রাথমিক দায়িত্ব হল ব্যাক্টিরিওফাজ কিউ-বিটা আক্রান্ত ব্যাক্টিরিয়ার কোষ থেকে কিউ-বিটার জেনেটিক সংকেত অনুসারে তৈরী আর্-এন্-এ-নির্ভর আর্-এন্-এ পলিমারেজ্ নামক উৎসেচকের (এন্‌জাইম) বিশুদ্ধিকরণ এবং পরীক্ষানলে (অর্থাৎ ট্রেস্টটিউবে) ঐ ভাইরাসের জেনেটিক আর্-এন্-এর আত্মপ্রতিলিপি সৃষ্টি ঠিক কীভাবে হয় তা পর্যবেক্ষণ করা। একজন উঠতি গবেষকের কাছে সে এক স্বপ্নের পরিবেশ — চারদিকে নামী নামী গবেষকেরা আণবিক জীববিদ্যার নানা জটিল সমস্যা নিয়ে গবেষণায় রত। তাঁদের দেখেও শিখে ফেলা যায় অনেক কিছু। আণবিক জীববিদ্যা বিষয়টাই তখন যথেষ্ট আলোড়ন-সৃষ্টিকারী — জীবের বংশগতির সাংকেতিক তথ্য ডি-এন্-এ থেকে মেসেঞ্জার আর-এন্-এর মাধ্যমে কোষের রাইবোজোমে কীভাবে প্রোটীন সংশ্লেষে পরিণতি পায়, তা নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বহু নামকরা গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কাজ চলছে। অমিয়বাবু পড়লেন কঠিন মানসিক দ্বন্দ্বে — এই নতুন বিষয়েই কাজ চালিয়ে যাবেন, না এদেশের অন্য কোনো গবেষণাগারে যোগ দেবেন যেখানে তাঁর পূর্বার্জিত জৈবরাসায়নিক পারদর্শিতা প্রত্যক্ষভাবে কাজে লাগবে, নাকি সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে দেশে ফিরে যাবেন ? মনের ভেতর থেকে কে যেন বলল, এগিয়ে চল নতুন পথেই। শুনলেন তিনি। বাকিটা আজ ইতিহাস।

নতুন পথে এগিয়ে চলার সিদ্ধান্ত যে কতখানি সঠিক ছিল, তার প্রমাণ তিনি পোস্ট্‌ডক্টরেট থাকাকালীন ভাল ভাল জার্নালে বেরোনো একাধিক উচ্চমানের গবেষণাপত্র এবং পরবর্তীকালে আণবিক জীববিদ্যার জগতে গবেষক হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া। নিউ জার্সির নাট্‌লিতে তখন সবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রোশ্ ইন্‌স্টিটিউট অফ মলিকিউলার বায়োলজি। সেখানকার গবেষণার খরচ যোগায় জাঁদরেল ওষুধ-প্রস্তুতকারক সংস্থা হফ্‌ম্যান লারোশ্। তারা বেছে বেছে সেরা কয়েকজন বিজ্ঞানীকে নিয়ে একটা বিশ্বমানের গবেষকদল তৈরী করছিল। নেতৃত্বে ছিলেন ন্যাশ্‌নাল ইন্‌স্টিটিউট্‌স্ অফ হেল্‌থের স্বনামধন্য বিজ্ঞানী ডঃ সিড্‌নি আন্ডেন্‌ফ্রেন্ড। তাঁরই এক সহকর্মী ডঃ অ্যারন শ্যাট্‌কিন (যিনি পরে ন্যাশ্‌নাল অ্যাকাডেমি আফ সায়েন্সের সদস্য হন এবং নিউ জার্সির পিস্‌ক্যাটাওয়েতে সেন্টার ফর অ্যাড্‌ভান্স্‌ড্ বায়োটেক্‌নোলজি অ্যান্ড মেডিসিন প্রতিষ্ঠা করেন) অমিয়বাবুকে সেখানে নিয়ে এলেন সিনিয়র পোস্ট্‌ডক্টরাল ফেলোশিপ দিয়ে। অতঃপর বছর তিনেক ডঃ শ্যাট্‌কিনের সঙ্গেই গবেষণা চলল রিওভাইরাস নামক একধরণের জীবাণু নিয়ে, যা মানুষের পাচনতন্ত্রকে সংক্রামিত করে। ভারত ও বাংলাদেশে যে ভাইরাস অগুনতি শিশুর আমাশয় ও আন্ত্রিক রোগের কারণ, সেই কুখ্যাত রোটাভাইরাসের নিকট আত্মীয় হল এই রিওভাইরাস। অবশ্য ভাইরাসঘটিত রোগব্যাধি নয়, অমিয়বাবুর গবেষণার মূল বিষয় ছিল এই ভাইরাসের বংশগতির সাংকেতিক তথ্যের ক্রমপ্রবাহ এবং জীবকোষের মধ্যে এদের সংখ্যাবৃদ্ধির পদ্ধতি। তাঁরা দেখলেন এই ভাইরাসের দশটি দু-ফেত্তা (ডাব্‌ল্-স্ট্র্যান্ডেড্) আর্-এন্-এ শুধু নয়, তার সঙ্গে আবার রয়েছে একটি উৎসেচক যা সেই আর্-এন্-এর মধ্যেকার সংকেত অনুসারে মেসেঞ্জার আর্-এন্-এ তৈরী করতে সক্ষম (যদি তার জন্য প্রয়োজনীয় মালমশলা অর্থাৎ অ্যাডিনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন ও ইউরাসিল নামক চারটি নিউক্লিওটাইড্ তাকে সরবরাহ করা হয়)। এই তিন বছরে বেরোনো কিছু মৌলিক গবেষণাপত্রের সুবাদে রোশ্ ইন্‌স্টিটিউটে অমিয়বাবু পাকাপাকিভাবে সহকারী গবেষকের পদ পেলেন, যা তাঁর স্বাধীনভাবে গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার পথ সুগম করল। অচিরেই হফ্‌ম্যান্ লারোশের সৌজন্যে হাতে পেলেন আমেরিকার গ্রীন কার্ড আর সহকারী গবেষক থেকে হয়ে গেলেন একেবারে সহকারী সদস্য। ইতিমধ্যে রোশ্ ইন্‌স্টিটিউটেরও ভোল পাল্টেছে, মাত্র এক দশকের মধ্যেই তা হয়ে উঠেছে পৃথিবীর এক অগ্রণী গবেষণাকেন্দ্র। আমেরিকার ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সের আট সদস্য এবং একজন

নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী তখন সেখানে কাজকর্ম করেন। ওখানেই কেটে গেল শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিজ্ঞানসাধনার ১৮ বছর। সহকারী সদস্য থেকে পূর্ণ সদস্য হলেন, আণবিক জীবাণুতত্ত্ব নিয়ে গবেষণায় পেলেন বিশ্বব্যাপী পরিচিতি। তাঁর গবেষণা মূলতঃ দুরকম ভাইরাস নিয়ে – ভেসিকিউলার স্টোমাটাইটিস ভাইরাস (যা মারাত্মক রেবিজ্‌ভাইরাসের মতোই একধরণের প্রাণী-ভাইরাস, ঘোড়া আর গবাদি পশুর শরীরে পাওয়া যায়) আর হিউম্যান্ প্যারাইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস (যা শিশুদের সংক্রামিত করে)। এরা 'নেগেটিভ্ স্ট্র্যান্ড আর্-এন্-এ ভাইরাস' গোষ্ঠীর সদস্য, যাতে রয়েছে ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাম, মাম্পস্, ইবোলা ইত্যাদি রোগের ভাইরাসও। জীবকোষে এই ভাইরাসগুলির সংক্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় বেশ কয়েকটি জৈবসংশ্লেষ বিক্রিয়াপথ (বায়োসিন্থেটিক পাথ্‌ওয়ে) তিনি ও তাঁর সহগবেষকরা আবিষ্কার করেন। শুধু তাই নয়, সংক্রামিত কোষের মধ্যে হিউম্যান্ প্যারাইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের জিনের বহিঃপ্রকাশ খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করে রিভার্স জেনেটিক্সের সাহায্যে ভাইরাসটির একটি পূর্ণদৈর্ঘ্যের ডি-এন্-এ অণু সংশ্লেষ করতে সক্ষম হন তাঁরা, যা কোষের মধ্যেকার বিশেষ আবহে আর্-এন্-এতে পরিণত হয় আর তার অসংখ্য প্রতিলিপি উৎপাদনের মাধ্যমে অসংখ্য ভাইরাস সৃষ্টি হয়।

এখানেই গল্পের শেষ হতো যদি, তাহলেও সে-গল্প হতো অনেকের কাছেই দৃষ্টান্তমূলক আর প্রেরণাদায়ক। কিন্তু অমিয়বাবুর মতো মানুষেরা যে অল্পে দাঁড়ি টানেন না। হফম্যান্ লারোশে থাকাকালীন তাঁর মনে আরো উচ্চপর্যায়ের ও কঠিনতর গবেষণায় অংশগ্রহণের একটা ইচ্ছে ঘুরপাক খাচ্ছিল। হঠাৎ করেই এসে গেল তার সুযোগ। একদিন 'সায়েন্স' নামক বিজ্ঞানপত্রিকাটির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে একদম শেষের দিকের 'কর্মখালি' অংশে দেখেন একটা বিজ্ঞাপন। জগদ্বিখ্যাত গবেষণা-প্রতিষ্ঠান ক্লীভ্‌ল্যান্ড ক্লিনিক ফাউন্ডেশনের নতুন শুরু হওয়া আণবিক জীববিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান খোঁজা হচ্ছে। কৌতূহলী হয়ে প্রতিষ্ঠানটি ও তার নতুন বিভাগটি সম্পর্কে আরো খোঁজখবর নেওয়ার পর একদিন একটা আবেদনপত্র ছেড়ে দিলেন তিনি। ভাবলেন দেখাই যাক না কী হয়। বেশ কয়েক সপ্তাহ কিছুই হলনা। উনিও ব্যাপারটা মন থেকে প্রায় মুছেই ফেলেছিলেন। এমন সময় একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে বেজে উঠল ফোন! ওপ্রান্তে চেয়ারম্যান পদের নিয়োগ-কমিটির সভাপতি। জানতে চাইছেন হফম্যান্ লারোশের স্থায়ী সদস্যপদ ছেড়ে এই নতুন দায়িত্বভার নিতে অমিয়বাবু সত্যিই আগ্রহী কিনা। উনি বললেন, কমিটি যদি ওঁকে বাছে, উনি ভেবে দেখতে রাজী আছেন। কমিটি ওঁকেই বাছল। শুরু হয়ে গেল শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈজ্ঞানিক জীবনের পরবর্তী অধ্যায়। সপরিবারে সেই যে ক্লীভ্‌ল্যান্ডে এসে উঠলেন, আজও ঐ শহরেরই বাসিন্দা।

গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারপার্সন তখন ডঃ বার্নাডিন হীলি। নামকরা হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞ। পরে ন্যাশনাল ইন্‌স্টিটিউট্‌স্ অফ হেল্‌থের কর্ণধার আর রেড্ ক্রসের অধিকর্তা হয়েছিলেন, রাষ্ট্রপতি জর্জ ডব্লিউ বুশের বিজ্ঞানবিষয়ক উপদেষ্টাও ছিলেন। তাঁর বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শিতা আর সহকর্মীদের অণুপ্রাণিত করার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। আণবিক জীববিদ্যার একটি সদ্যপ্রতিষ্ঠিত বিভাগকে প্রায় শূন্য থেকে শুরু করে বৈজ্ঞানিক গবেষণার একেবারে প্রথম সারিতে নিয়ে আসার যে দুরহ চ্যালেঞ্জ, তার মোকাবিলায় অমিয়বাবুকে সর্বতোভাবে এবং নিঃশর্তভাবে সাহায্য করেছিলেন তিনি। এ ব্যাপারে অমিয়বাবুর অগ্রণী ভূমিকা আর বিচক্ষণ নেতৃত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকেই সমগ্র গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির কার্যনির্বাহী চেয়ারম্যান মনোনীত করা হল, যখন ডঃ হীলি ন্যাশনাল ইন্‌স্টিটিউট্‌স্ অফ হেল্‌থের দায়িত্ব পেয়ে ক্লীভ্‌ল্যান্ড ছেড়ে চলে গেলেন। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানেই প্রতিষ্ঠানটির পরবর্তী চেয়ারম্যান এবং তার অধীনস্থ কয়েকটি বিভাগের নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগের প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হল। আর তিনি নিজে রয়ে গেলেন আণবিক জীববিদ্যা বিভাগের প্রধান। পরে ভাইরাস-সংক্রান্ত গবেষণার একটি আলাদা বিভাগ খোলা হলে তারও বিভাগীয় প্রধান হন তিনি। ততদিনে অবশ্য ক্লীভ্‌ল্যান্ড ক্লিনিকের গন্ডী ছাড়িয়ে তাঁর কাজকর্মের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে নিকটবর্তী কেস্ ওয়েস্টার্ন রিজার্ভ ইউনিভার্সিটিতেও। সেখানকার জৈবরসায়ন, আণবিক জীববিদ্যা আর জীবাণুবিদ্যার বিভাগগুলির সঙ্গে বিবিধ গবেষণায় জড়িয়ে পড়েছেন তিনি। আজ জীবনের সায়াহ্নে এসে ক্লীভ্‌ল্যান্ড ক্লিনিকের সেই গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির (যার বর্তমান নাম 'লার্নার রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট্') একজন অবসরপ্রাপ্ত সদস্য তিনি, আর তাছাড়াও কেস্ ওয়েস্টার্ন রিজার্ভ ইউনিভার্সিটির ঐ

বিভাগগুলিতে অধ্যাপক । কলকাতা থেকে ক্লীভ্‌ল্যান্ড — তাঁর পেশাগত জীবনের এই সুদীর্ঘ যাত্রায় দুশোরও বেশী গবেষণাপত্র লিখেছেন তিনি, যার অনেকগুলোই ছেপে বেরিয়েছে বিভিন্ন নামকরা বিজ্ঞানপত্রিকায় । এছাড়াও বহু বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ আর পাঠ্যপুস্তকের অধ্যায় বেরিয়েছে তাঁর হাত থেকে । তাঁর অধীনে গবেষণা করেছেন পঞ্চাশেরও বেশী পোস্ট্‌ডক্টরাল ফেলো, চারজন ছাত্রছাত্রী ডক্টরেট করেছেন তাঁর তত্ত্বাবধানে । এঁরা অনেকেই আজ শিক্ষাজগতে বা নানা শিল্পপ্রতিষ্ঠানে উচ্চপদাধিকারী । এই ছাত্রছাত্রীদের পেশাগত সাফল্যের কী মন্ত্র শিখিয়েছেন তাঁদের অধ্যাপক ? অমিয়বাবু জানাচ্ছেন তিনি তাঁদের বারবার বলতেন যে, গবেষণা জিনিসটা নটা-পাঁচটার চাকরি নয়, তার চেয়ে অনেক বড় কিছু । একজন গবেষককে দিবারাত্র শয়নে-স্বপনে-ঘুমে-জাগরণে তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে হবে, নিত্যনতুন পরীক্ষানীরিক্ষার পরিকল্পনা করতে হবে । তবেই না আসবে কাজে উৎসাহ । আর এসবের জন্য চাই তীব্র অনুসন্ধিৎসা, জ্ঞান আহরণের সুতীব্র খিদে । একটা কথা তিনি নিজে চিরকাল বিশ্বাস করে এসেছেন — যদি কোনোদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে তোমার মনে হয় 'ইস্, আজও আবার ল্যাবে যেতে হবে !', বুঝবে তোমার বৈজ্ঞানিক গবেষণা ছেড়ে অন্য পেশায় যাওয়ার সময় হয়েছে ।

কথায় বলে, যেকোনো সফল পুরুষের সাফল্যের পিছনে থাকেন একজন সুযোগ্য সহধর্মিনী । অমিয়বাবুর ক্ষেত্রে কথাটা সত্যি বললে কম বলা হবে । কারণ শ্রীমতী শিপ্রা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অর্ধাঙ্গিনীই শুধু নন, নিজেও একজন সফল বিজ্ঞানী । স্বামীর মতো তিনিও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শৈলেশ রায়ের কাছে ক্যান্সারের জৈবরসায়নে ডক্টরেট করে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে নিউ ইয়র্কের অ্যাল্‌বার্ট আইন্‌স্টাইন কলেজ অফ মেডিসিনে গবেষণা করতে আসেন । সেখানে ডঃ আব্রাহাম হোয়াইটের তত্ত্বাবধানে গবেষণা সম্পন্ন করার পর দীর্ঘ পনেরো বছর নিউইয়র্ক মেডিক্যাল স্কুলে অধ্যাপনা করেন । তারপর অমিয়বাবু যখন ক্লীভ্‌ল্যান্ড ক্লিনিকে এলেন, তিনিও সেই গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির ক্যান্সার জীববিদ্যা বিভাগের একজন সদস্য হয়ে আসেন । প্রায় এক দশক হল তিনি সক্রিয় গবেষণায় ইতি টেনেছেন । কিন্তু অবসরজীবনে কোনোরকম শূন্যতা গ্রাস করতে পারেনি তাঁকে । কারণ তাঁদের চার নাতি-নাতনী । অর্থাৎ অমিয়বাবু আর শিপ্রাদেবীর মেয়ে রিনির দুই ছেলে রাকেশ আর রবি, এবং তাঁদের ছেলে অর্জুনের দুই মেয়ে লিলি আর আরিয়া । ওদের দিকে তাকিয়ে তাঁর রবীন্দ্রসঙ্গীত-গুরুর একটা বিখ্যাত গানের দু-কলি গাইতেই পারেন অমিয়বাবু — 'তোমার হল শুরু, আমার হল সারা, তোমায় আমায় মিলে এমনি বহে ধারা' । আর জীবনের এই পড়ন্তবেলায় নিজের সাফল্যমন্ডিত কর্মজীবনের দিকে ফিরে তাকিয়ে তৃপ্তকণ্ঠে বলতে পারেন, 'ভরা থাক, ভরা থাক স্মৃতিসুধায় হৃদয়ের পাত্রখানি —'।

উড়ো কাগজের টুক্‌রো

রমা জোয়ারদার, New Delhi, India

পূর্ব দিল্লীতে নবোদয় এনক্লেভের পুজোর এবার পঁচিশ বছর হল । এলাকার বাসিন্দারা সবাই হাত খুলে চাঁদা দিয়েছে । বিজ্ঞাপন আর স্পন্সরশিপ মিলিয়ে টাকা বেশ ভালো উঠেছে । সান্ধ্য অনুষ্ঠানের জন্য কলকাতা থেকে নামী-দামী শিল্পীদের আনা হচ্ছে । স্থানীয় শিল্পীরাও নাচ, গান, নাটক ইত্যাদির জন্য অনেকদিন ধরে রিহার্সাল্ দিয়ে তৈরী হয়েছে । পঁচিশ বছর উপলক্ষে চার দিনে ভোগ-প্রসাদের মধ্যে রোজ একটি করে বিশেষ পদ রাখা হয়েছে । বাচ্চাদের জন্য নানা রকম প্রতিযোগিতা প্রতি বছরই হয়, এবারেও হচ্ছে; কিন্তু তাতেও পুরষ্কারগুলো একটু ভালো দেওয়া হচ্ছে ।

শিবতোষ ভট্টাচার্য একজন শিল্পী — অকৃতদার ভবঘুরে মানুষ । দিল্লীতে নবদয় এনক্লেভে একটা ফ্ল্যাট রেখে দিয়েছেন, কিন্তু বছরের মধ্যে সাত-আট মাসই তিনি — এদিক ঘুরে বেড়ান । তবে পূজোর সময়টা তিনি দিল্লীতেই থাকেন — আর প্রতি বছর ছবি আঁকার প্রতিযোগিতার প্রধান বিচারক তিনিই হন । এ বছরে তিনি জানিয়েছেন যার আঁকা ছবি ওনার সবচেয়ে ভালো মনে হবে, তাকে তিনি পাঁচ হাজার টাকার একটি বিশেষ পুরষ্কার দেবেন । আর শুধু তাই নয়, উপযুক্ত মনে হলে সেই প্রতিযোগিকে তিনি নিজে আঁকা শেখাবেন । এই খবরটি প্রচার হওয়াতে এবারের ‘বসে আঁকো’ প্রতিযোগিতায় ছেলেমেয়েদের সংখ্যা অন্য বারের চেয়ে অনেক বেশী ।

প্রতি বছরের মতো এবারও পুজো হচ্ছে এখানকার বড় পার্কে — যার নামই হয়ে গেছে দূর্গা পার্ক । পুজোর দুসপ্তাহ আগে থেকেই পার্কে মন্ডপ তৈরীর কাজ শুরু হয়েছে । পার্কের মাঝখানে পূজামন্ডপ । তার পাশে কিছুটা জায়গা খালি রেখে বানানো হয়েছে একটা বিরাট বড় প্যান্ডেল যার এক প্রান্তে রয়েছে একটা বড় স্টেজ্ । আলো, নানা রঙের পর্দা, হাতে আঁকা ছবি, শোলার কাজ ইত্যাদি দিয়ে স্টেজ্‌টা সুন্দর করে সাজানো হয়েছে । প্যান্ডেলের বাকী অংশে অনেক চেয়ার সাজিয়ে দর্শকদের বসার জায়গা করা হয়েছে ।

সপ্তমীর দিন সকাল বেলা পুজো মন্ডপে ভীষণ ভীড় । খনিক আগে সপ্তমী পুজোর প্রথম বারের অঞ্জলি হয়ে গেছে — দ্বিতীয় বারের অঞ্জলির প্রস্তুতি চলছে । ঝলমলে সজ্জায় মা-দূর্গার মূর্তি থেকে যেন তেজ রাশি বিচ্ছুরিত হচ্ছে । তার চোখে অভয় বাণী । কত লোক আসছে — শুধু বাঙালির নয়, অবাঙালিরা অনেক আসছে । কেউ ঠাকুর দেখতে, কেউ অঞ্জলি দিতে কেউ ডালি সাজিয়ে পুজো দিতে আসছে । ওরই মধ্যে একটা বাচ্চা ছেলে — দেখলে মনে হয় বছর আষ্টেক বয়স — গুটি গুটি পায়ে পুজো মন্ডপে ঢুকল । আধ ময়লা সার্ট-প্যান্ট, পায়ে একটা সস্তা জুতো, এলোমেলো চুল, কাঁধে একটা ঝোলা যা থেকে দু-একটা বই-খাতা উঁকি মারছে । হয় তো স্কুল থেকে ফিরছে, নয় তো স্কুল পালিয়েছে । বাচ্চাটা প্রতিমা দেখবার জন্য এদিক-ওদিক দিয়ে গুঁতোগুতি করে সামনে যাবার অনেক চেষ্টা করল — কিন্তু অত লোকের ভীড়ে সুবিধা করতে পারল না । ভীড়ের মধ্যে দু-একটা ধাক্কা ধুক্কি খেল, খুচরো দু চারটে বকুনি শুনলো, শেষে প্রতিমা দেখার আশা ছেড়ে দিয়ে সে পুজোমন্ডপের বাইরে চলে এল । ঘুরে ফিরে মন্ডপের সাজ সজ্জা দেখতে দেখতে তার নজরে পড়ল যে বড় প্যান্ডেলের সামনে একটা টেবিলের উপর প্রসাদের টুক্‌রি নিয়ে দুটো ছেলে-মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে । টেবিলের সামনে লোকেদের লম্বা লাইনে বাচ্চাটাও দাঁড়িয়ে গেল । দোনাটা হাতে পেতেই কাছেই ঘাসের উপর বসে সে চট্‌পট্ প্রসাদটা খেয়ে ফেলল, আর খালি দোনাটা কাছে রাখা নোংরা ফেলার ঝুড়িতে ফেলে দিল । স্বচ্ছতার অভিযানের কথা সেও জানে বই কি — স্কুলে শিখিয়েছে, আর রমেশদের বাড়িতে টিভিতেও দেখেছে !

হাতটা প্যান্টে মুছতে মুছতে সে এবার বড় প্যান্ডেলের ভিতরে ঢুকে পড়ল । প্যান্ডেলের শেষ প্রান্তে একটা স্টেজের উপর অনেক বাচ্চারা বসে আছে । তাদের সবার কাছে

বোর্ড, গোটা গোটা রঙ পেন্সিলের বাক্স, কারও কাছে আবার জল রঙ, তুলি এসবও আছে। বোর্ডের উপর সাদা কাগজ এঁটে বেশীরভাগ বাচ্চাই আঁকা শুরু করে দিয়েছে। কেউ কেউ তখনও ব্যাগ কাঁধে দৌড়ে দৌড়ে আসছিল। ভলান্টিয়ার অলকেশের হাতে অনেকগুলো সাদা কাগজ – নতুন কেউ এলেই সে তার হাতে কাগজ ধরিয়ে দিয়ে নির্দেশ দিচ্ছিল – 'কাগজের ডান দিকে নিজের নাম, ঠিকানা আর ক্লাস গোটা গোটা করে লিখবে!'

বাচ্চাটা স্টেজের নিচে থেকেই উঁকি ঝুঁকি মারছিল। হঠাৎ অলকেশের হাতের গোছাভরা কাগজ থেকে একটা উড়ে ছেলেটার ঠিক পায়ের কাছে এসে পড়ল! এদিক ওদিক তাকিয়ে সে ওই কাগজটা তুলে নিয়ে পিছনের একটা চেয়ারের কাছে গিয়ে ঝোলা থেকে একটা পেন্সিল বার করল, আর তারপর একটা চেয়ারে কাগজটা রেখে আপন মনে আঁকি-বুকি করতে লাগল। ক্রমশঃ সে আঁকি-বুকি থেকে একটা ছবি স্পষ্ট হতে থাকল – একটা ছোট মাটির বাড়ি, সামনে একটা সরু রাস্তা, এপাশে ওপাশে কিছু গাছ-পালা, দূরে একটা পাহাড়, সেই পাহাড়ের মাথায় একটা মন্দির, আর এই সবের উপরে রয়েছে এক নারী! কোন সুন্দরী রমণী বা স্নিগ্ধ মাতৃমূর্তি নয় – রোগা, রুক্ষ এলোচুলের এক খেটে খাওয়া নারীর চেহারা। মনে হচ্ছে যেন উদ্‌ভ্রান্তের মত চলেছে সে! ছেলেটা মন দিয়ে ছবি আঁকছিল। হঠাৎ তার আঁকা ছবির নারীটি জীবন্ত হয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে তার কাছে এসে দাঁড়াল। এসেই ধাই ধাই করে ছেলেটার পিঠে কয়েকটা কিল বসিয়ে দিয়ে দেহাতি ভাষায় বলে উঠল – 'আমি কখন থেকে তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর তুই এখানে বসে আছিস? ভেবে মরছি – গাড়ির তলায় পড়ে আপদ গেল নাকি বদ্ লোকে উঠিয়ে নিয়ে গেল? আর দেখ – এখানে কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে! চল্ চল্ এখনি . . .'। প্রথম চমকানিটার পর ছেলেটার হতভম্ব ভাবটাও কাটতে সময় পেলনা, তার মা তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল। অর্দ্ধেক আঁকা ছবিটা চেয়ারের উপর তেমনিই পড়ে রইল।

ঘটনার শেষটুকু স্টেজের উপর থেকে অলকেশের চোখে পড়েছিল। কৌতুহল বশতঃ সে এগিয়ে এসে চেয়ারের উপর থেকে ছবিটা তুলে নিল। অলকেশ শিল্পী নয় – তবুও পেন্সিলে আঁকা সেই ছবিটা দেখে তার মনে হল খুদে শিল্পীটি এঁকেছে ভাল। সে ছবিটা নিয়ে গিয়ে মন্ডপের একধারে বসে থাকা শিবতোষকে দেখাল। শিবতোষ ছবিটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন, তারপর বলে উঠলেন – 'অপূর্ব, অসাধারণ! এ তো একেবারে জাত শিল্পী! কত বড় বাচ্চাটা? এবারের পুরস্কারটা এই পাবে!' আমতা আমতা করে অলকেশ বলল – 'কিন্তু পুরস্কার দেবেন কাকে? কাগজে তো নাম-ধাম কিছুই নেই!' ঘটনাটা যতটুকু যেরকম দেখেছে সেটা সে শিবতোষকে জানাল। শিবতোষ কাঁচা পাকা চুলে ভরা মাথাটা একটু একটু দোলালেন – মুখে মৃদু হাসি, বললেন – 'এই ছবিই একদিন ওকে নাম-ধাম সব দেবে। রেখে দাও স্কেচ্‌টা; আমি ঠিক খুঁজে পাব ওকে! প্যান্ডেলে যখন অন্য ছবিগুলো টাঙ্গাবে, তখন সবার উপরে এই ছবিটা রেখো! ও আসবে, ঠিক আসবে!'

আঁকা জায়গায় অলকেশ ছাড়া আরও দুজন ভলান্টিয়ার ছিল – তনুশ্রী বাচ্চাদের আঁকা ছবিগুলো সংগ্রহ করে টেবিলের উপরে থাকে থাকে গুছিয়ে রাখছিল। অলকেশ পেন্সিলে আঁকা অনামী ছবিটা তনুশ্রীর হাতে দিয়ে বলল – 'শিবতোষদা এই ছবিটা অন্য ছবিগুলোর সাথে রাখতে বলেছেন। এটাকে যত্ন করে রেখে দাও!' ইতিমধ্যেই কেউ একজন তনুশ্রীকে স্টেজের অন্য দিকটায় ডাকল। একটা থাকের সব চেয়ে উপরে নামধামহীন ছবিটা রেখে দিয়ে তনুশ্রী অন্যদিকে চলে গেল। পিন্টু এবার ছবিগুলো বিচারকদের কাছে জমা করার জন্য এগিয়ে এলো। সবার উপরে রাখা পেন্সিল স্কেচ্‌টা উল্টে-পাল্টে দেখে সে ভাবল – 'এতে তো নাম-ঠিকানা কিছুই নেই; এটা এখানে কে রাখলো!' ছবিটা সে অপ্রয়োজনীয় কাগজের টুক্‌রো মনে করে নীচে ফেলে দিলো! কাগজটা উড়ে গিয়ে দু-সারি চেয়ারের মাঝের ধুলোমাটি ভরা যাতায়াতের পথটার উপর পড়ল! স্টেজের অন্য দিক থেকে দেখতে পেয়ে তনুশ্রী চেঁচিয়ে উঠল – 'পিন্টু, ওই কাগজটা ফেলিস্ না!' কিন্তু মাইকে তখন ঘোষণা শুরু হয়েছে – 'একটু পরেই রিলে রেস্ শুরু হবে, বাচ্চারা তাড়াতাড়ি খেলার জায়গায় চলে এস!' পিন্টু তনুশ্রীর কথা ঠিক মতো শুনতে না পেয়ে কানের কাছে হাত নিয়ে জিজ্ঞাসা করল – 'কি রে, কি বলছিস্?' কিন্তু

রিলে রেসের ঘোষনা শেষ হতে না হতেই পুজোমন্ডপে দুম্-দুমা-দুম্ ঢাকের বাদ্যি বেজে উঠল, আর সেই আওয়াজে তনুশ্রীর উত্তর চাপা পড়ে গেল ! ছবিটা বাঁচাতে সে তড়ি-ঘড়ি পিন্টুর দিকে আসছিল, কিন্তু তার আগেই সেই ছবিটার উপর দিয়ে অনেকগুলো জুতো-চটি পরা ছোট-ছোট পা ছুটে চলে গেল । ছেঁড়া ফাটা নোংরা কাগজের মধ্যে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন উদ্‌ভ্রান্ত রমনী মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে রইল !

রমা জোয়ারদার দিল্লীর বাংলা সাহিত্য মহলে একটি পরিচিত নাম । গত কুড়ি বছর ধরে দিল্লী, পশ্চিমবাংলা ও উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর গল্প, প্রবন্ধ, রম্য রচনা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়ে চলেছে । বিজ্ঞানের ছাত্রী হওয়া সত্বেও তিনি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে ছেলেবেলা থেকেই অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন । পরবর্তী কালে তিনি মঞ্চোপযোগী পরীক্ষা-নিরীক্ষা মূলক অনুষ্ঠান ও সাহিত্য কর্মে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন । প্রকাশিত ছোট গল্প সংকলনঃ (১) রোজ নামচার ছেঁড়াপাতা; (২) সবুজ ঢেউ আর ঝাপসা চাঁদ ।

“শিউলি তলার পাশে পাশে ঝরা ফুলের রাশে রাশে
শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে অরুণরাঙা চরণ ফেলে
নয়ন-ভুলানো এলে ।”

বাইশে শ্রাবণ

আনন্দ সেন, Ann Arbor, Michigan

সকাল থেকে মাঝ আকাশে মেঘ জমে
লোডশেডিং এ চুলের গোড়ায় ঘাম নামে ।

বাজার মুখো চটির মৃত্যু রাস্তাতেই
এবার গ্রীষ্মে আমের তেমন ফলন নেই ।

গলির মোড়ে কফির দোকান সরগরম
কলেজ স্ট্রীটে বইপাড়ায় আজ বিক্রি কম ।

গাড়ীর কাঁচে বৃষ্টি মোছে উদাস চোখ
ছন্দ ছাড়াই হাঁটছে পথে হাজার লোক ।

স্কুলের ছেলে পিঠের উপর ব্যাগের চাপ
মানুষ হয়ে রাখতে হবে পায়ের ছাপ ।

অফিস ফেরত ভাবনাগুলো হোঁচট খেলো
মলের আলোয় সেলফিতে মুখ হারিয়ে গ্যালো ।

ভাসছিল দিন একঘেয়ে রোজ যেমন ভাসে
ফোনের বুকে হঠাৎ কখন মেসেজ আসে ।

সন্ধ্যে বেলা চিলেকোঠার একলা ঘরে
আকাশ এখন অন্য রঙে জানলা জুড়ে

হঠাৎ যেন কাঁপছে পাতা, গাইছে বাতাস
ওরা জানে আজ বাইশে, শ্রাবণ মাস ।

ধুলোয় মোড়া সঞ্চয়িতায় পড়ল হাত
ইউটিউবে দেবব্রতর জ্যোৎস্না রাত ।

হাতড়ে অতীত চ্যাটের ঘরে আলাপচারি
সর্বনেশে চোখ ছিল তার, এখন বুড়ি ।

হঠাৎ ঝেঁপে কাব্যি এল মাঝরাতে
সারা শহর ব্যস্ত তখন বৃষ্টি খেতে ।

কালকে থেকে দিনের পরে দিন যে যাবে,
যেমন যায় ।

আসছে বছর আবার কোথাও দ্যাখা হবে
পূর্ণিমায় ।

তারিণী মামা

নন্দিতা রায়, Ottawa, USA

আমাদের ছোট্ট সংসারে ধরাবাঁধা জীবনযাত্রার মধ্যে তারিণী মামার আগমন সত্যি একটা আলোড়ন এনেছে। ঠিক পুকুরের মাঝখানে একটা ঢিল পড়ার মত। চারিদিকে তরঙ্গ। ব্যাপারটা একটু খুলে বলি।

তারিণী মামার আসল নাম তারিণী না, বিশ্বজিৎ। কিন্তু কেমন করে তা তারিণী হল সেটা বিচার্য। মার কাছে শুনেছি পাড়ার লোকের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করার ক্ষমতা থাকায় তারাই ঐ নাম দিয়েছে। তবে মামা আমার শুধুই যে পরোপকারী তাই নয়, চেহারাটাও খুব সুন্দর। তার ওপর দাদামশাইয়ের সঞ্চিত অর্থ হাতে থাকায় সাজগোজও বেশ উঁচুদরের।

সেদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে রান্নাঘর থেকে সুস্বাদু রান্নার গন্ধ আর তার সাথে মায়ের গাওয়া গান একসাথে নাকে আর কানে স্বাদ সুরের গুঞ্জন তুলল। বুঝলাম, আজ বাড়িতে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। বাবাকে জিজ্ঞেস করে জানলাম আমার ছোটমামা, যার নাম তারিণী, তিনি আসছেন এবং বেশ কিছুদিন থাকবেন। জেনে ভারী ভালো লাগল। বাবা, মা নিজেদের কথায় ব্যস্ত থাকেন সেখানে প্রায়ই মুখ খুলতে পারিনা। এবার আমার সাথে কথা বলার একজন লোক হল।

সন্ধ্যাবেলায় নিজে ড্রাইভ করে মামা এলেন। নতুন ঝকঝকে গাড়ি আর তার সাথে দামী পোষাক সব মিলিয়ে একটা মনোরম আবহাওয়ার সৃষ্টি করল। পরদিন সকালবেলায় চা খেতে খেতে মামা বাবাকে বললেন পাশের পাড়ায় কে একজন প্রফুল্লবাবু আছেন যিনি একটা বড় কোম্পানী চালান। তাঁকে চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসারও বলা যায়। তাঁর রিসার্চ এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টে একটা বড় রকমের এক্সপ্যানসন হবে। একটা এনট্রিলেভেলের চাকরি শিগ্‌গীরই খালি হবে। দরখাস্ত দিয়ে কোন ফল হয়নি। বাবা বললেন, 'ও রকম দরখাস্ত ওদের মত অফিসে রোজ একশটা করে আসে। ওতে কোন ফল হবেনা। দরকার একটা পার্সনাল টাচের।' আমার স্কুলে যাবার সময় হল, তাই মামার কথা আর শোনা হলনা। এরপর থেকে প্রতিটি দিনই উৎসবের মত মনে হল। মামা নানারকমের জোক জানেন। হাসাতেও পারেন খুব। কাজেই দিনগুলো খুব আনন্দেই কাটতে লাগল।

সেদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে একটু ফুলুরি খেতে ইচ্ছে করছিল, তাই বাজারের মধ্যে দিয়ে ফুলুরির ঠোঙা হাতে নিয়ে আসছিলাম। হঠাৎ দেখি লুঙি আর আধময়লা গেঞ্জি পরে একজন আসছে তার হাতে বাজারের থলে। আরে, ইনি তো ছোটমামা দেখছি। পেছন পেছন দূরত্ব রেখে চলতে লাগলাম। দেখি থলে থেকে ঝুলছে গলদা চিংড়ির বড় বড় পা। পাশ থেকে একটা বড় রুইমাছের মাথাও দেখা যাচ্ছে। এ ছাড়া নানা রকমের শব্জিও আছে। আশ্চর্য, যে মানুষ দামী জামাকাপড় ছাড়া পরেননা তার এই সাজ ! মামা আমাদের পাড়া ছাড়িয়ে পাশের রাস্তায় ঢুকলেন। একটা প্রকাণ্ড গেটওয়ালা বাড়ির ভেতর মামা ঢুকে গেলেন। বাড়ি ফিরে মাকে একথা বলাতে মাও অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, আমারও দেখার ভুল হতে পারে।

আমার পরীক্ষা সামনে, তাই আমিও আর মাথা ঘামালাম না। টেস্ট পরীক্ষা শেষ হতে দুইমাস কেটে গেল। একদিন বাড়ি ফিরে বিরিয়ানি আর চপ কাটলেটের গন্ধ পেলাম। এ ঢাবার বিরিয়ানি — আঃ আমি যা খেতে ভালোবাসি। খাবারঘরে ঢুকে দেখি মামা বসে, পাশে তিনটে গিফটের প্যাকেট আর টেবিলের ওপর রাশিকৃত খাবার। অবাক হয়ে ভাবছি কি বলব তখন মা রহস্যটা খুলে বললেন। তারিণীমামার প্রফুল্লবাবুর কোম্পানীতে চাকরিটা হয়েছে। পার্সনাল টাচের কোন উপায় না দেখে মামা বুদ্ধি করে প্রফুল্লবাবুর বাড়িতে চাকরের কাজ নিয়েছিলেন। ভালো ভালো খাবার খেয়ে একদিন ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে আজকাল বাজার করে ?' স্ত্রী উত্তর দিলেন, 'নতুন চাকর রেখেছি, খুব স্মার্ট। আগের চাকরকে যে টাকা দিতাম একেও তাই দিই কিন্তু দেখ এ কত ভালো ভালো মাছ তরকারি এনে দেয়।' প্রফুল্লবাবু বললেন, 'ওকে ডাক।' তারিণীমামা ছেঁড়া লুঙ্গিটাকে একটু বেশি করে

দেখিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন। প্রফুল্লবাবু, 'আর কি জান? লেখা পড়া কিছু করেছ?' মামা বললেন, 'হ্যাঁ সার, আমি দলাই মলাই করতে জানি। ঘাড়ের ব্যথায় মালিশ করতে পারি। এম্ এস্‌সি পাশ করেছি, তবে কোন কাজ পাইনি। যা দিনকাল পড়েছে।' 'দেখছি তুমি ভদ্রঘরের ছেলে — আহা, কী বিপদেই না পড়েছ। দেখি, কি করতে পারি। ইতিমধ্যে তুমি আমার ঘাড়ের ব্যথাটায় একটু ম্যাসাজ করে দিও।' পার্সনালটাচে ইনটিম্যাসি আর তার ফলে এই চাকরি।

মামাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'অত কম টাকায় অত ভালো ভালো জিনিষ তুমি কিনলে কী করে?' মামা, 'আরে তাই কি হয়? নিজের পকেট থেকে কিছু দাদন দিলাম। দাদন কি বুঝলি তো? ওটা হল কিছু অগ্রিম দান। ইনভেস্টমেন্টও বলতে পারিস।' মামা একটা গিফটের প্যাকেট আমার হাতে দিলেন। খুলে দেখি একটা চমৎকার হ্যান্ডব্যাগ। ঠিক করলাম কালই ওটা নিয়ে স্কুলে যাব।

স্কুলে আমার প্রিয় বান্ধবী সলিলাকে বললাম, 'দেখ, মামা আমাকে এই হ্যান্ডব্যাগটা দিয়েছেন। কী সুন্দর তাই না?' সলিলা শুনে খানিক্ষণ চোখ নামিয়ে রাখল। তারপর সেখান থেকে টপটপ করে জল পড়তে লাগল। আমি তো অবাক। বললাম, 'আরে তুই কাঁদছিস কেন?' অনেক সাধ্য সাধনার পর জানলাম সলিলার মামা নেই। সলিলা বলল, 'সকলের মামা আছে আমার কোন মামা নেই। এ যে কী দুঃখ।' বাবাকে বললাম সলিলার দুঃখের কথা। বাবা, মা দুজনেই হাসলেন। মা বললেন, 'মামা তো কিনতে পাওয়া যায়না নাহলে তুই না হয় তাই কিনে দিতিস।' বাবা কিন্তু একটা সমাধান বের করে বললেন, 'তারিণীকে জিজ্ঞেস কর ও রাজি আছে কিনা। সলিলা তাহলে ওকে অ্যাডপ্ট্ করুক। তোরা মামাকে ভাগ করে নে।'

পরের দিন সলিলাকে বললাম বাবার কথা। ও শুনে খুসি হয়ে উঠল তারপরেই আবার গম্ভীর হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হল?' ও বলল, 'তোর মামা রাজি হবেননা। তুই তোর মামাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নে আর আমি আমার বাবা, মাকে গিয়ে বলি। দেখি তাঁরা রাজি আছেন কিনা।' মামা বরাবরের পরোপকারী তাই রাজি হয়ে গেলেন। সলিলার বাবা, মা বললেন, 'জানাশোনা পরিবারের ছেলে। ঠিক আছে। মেয়ে যাতে খুসি থাকে তাই হোক।'

ডবল মামাগিরির উদ্বোধনে মামা তিনটে সিনেমার টিকিট কেটে আনলেন। আমরা দুই ভাগ্নী আর মামা নিজে। হলে মামা সলিলার পাশেই বসলেন। আমার একটু হিংসে হল। তা যাইহোক সলিলার জন্যেই তো সিনেমায় আসা তাই মেনে নিলাম। ইতিমধ্যে মামা মার কাছে চা আর কফি বানানো শিখতে লাগলেন। বললেন অফিসের সহকর্মীদের একটু এনটারটেইন করবেন। মাঝেমাঝে হোমিওপ্যাথিক ওষুধের বই থেকে কি সব দেখতে লাগলেন। একদিন কাজের লোকটাকে চা বানিয়ে খাওয়ালেন। কী আশ্চর্য, লোকটা একটু বাদেই ঘুমিয়ে পড়ল। ডাকাডাকিতে জেগে উঠে বলল তার দোষ নাই। চায়ে ফোলা ছিল তাই সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। মা মামাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'চায়ে ফোলা গেল কি করে?' মামা উত্তর দিলেন, 'রাত্তিরে ঘুম হয় না তাই এর ওপর একটা এক্সপেরিমেন্ট করছিলাম। একটু পাসিফ্লোরা মিশিয়ে চা খেলে যদি ঘুম আসে।' আমরা মামার বানানো চা খেলাম তবে ফোলা ছাড়া। খুবই ভালো স্বাদ।

আমার ফাইন্যাল পরীক্ষার আর বেশি দেরি নাই। তাই টিউটোরিয়াল আর রাতজেগে পড়ার চক্রে পড়ে সংসারের আর কোন খবরই রাখতে পারলাম না। পরীক্ষার শেষদিনে বন্ধুদের সাথে লেকের ধারে বেড়িয়ে এসে বাড়িতে ঢুকতেই আবার সেই সুখাদ্যের সুগন্ধ! দেখলাম মামা মার জন্যে একটা শাড়ি, আমার আর সলিলার জন্যে দুটো প্যাকেট টেবিলে সাজিয়ে রেখেছেন। শুনলাম মামার উন্নতি হয়েছে। এত তাড়াতাড়ি উন্নতি হওয়াতে একটু আশ্চর্য না হয়ে পারলাম না। কিন্তু কী করা যাবে! মামার বসকে প্রফুল্লবাবু তিন থেকে চারবার অফিসের টেবিলে মাথা রেখে ঘুমাতে দেখেছেন। ফলে, ভদ্রলোকের ট্রান্সফার হয়েছে এবং মামা তাঁর জায়গায় বসেছেন। আমার হঠাৎ মনে হল এর মধ্যে চায়ে ফোলার কোন অবদান নেই তো? সলিলাকে ডেকে এনে দুজনে প্যাকেট খুললাম। আমার জন্যে একটা সোয়েটার আর সলিলার জন্যে একটা দামী সেন্ট। আমার একটু ঈর্ষার উদ্রেক হল। যাইহোক, মনের দুঃখ মনেই চেপে রাখলাম।

পরীক্ষায় পাশ করে আমি আর সলিলা দুইজনে দুই ভিন্ন কলেজে ভর্তি হলাম। মামা আমাদের রেষ্টুরেন্টে খাওয়াতে নিয়ে গেলেন। সারাপথ গল্প করতে করতে বাড়ি এলাম। এরপর আমি বেশ ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। হস্টেলে

থেকে পড়ি। উইকএন্ডে বাড়ি আসি আবার একদিন বাদেই চলে যেতে হয়, তাই বন্ধুদের সাথে আর দেখা হয় না। শুনি মামা মাঝেমাঝে সলিলাদের বাড়ি যান। ও বাড়ি থেকেই কলেজে যায় তাই।

পরীক্ষার শেষে বাড়ি এসেছি। এবার অখন্ড অবসর। কিন্তু মামার আর পাত্তা পাওয়া যায় না। সন্ধ্যেবেলায় খাওয়ার সময়ে আসেন আর কোনমতে খেয়েই আবার চলে যান। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলেন যে অফিসে ভীষণ কাজ। ওঁর বস বুড়ো মানুষ, তাই মামা তাঁকে তাড়াতাড়ি বাড়ি পাঠিয়ে দেন। নিজে অনেকক্ষণ অফিসে থেকে কাজ শেষ করে বাড়ি আসেন। যাক, এইভাবে কাজ করে ওপর ওয়ালার নজরে পড়লে উন্নতি অনিবার্য ! হলও তাই। এক্সপ্যানসনের সময়ে বড়কর্তা বললেন, 'ইয়ং আর এনারজেটিক লোককে ম্যানেজমেন্টে নেওয়া হোক।' ফলে, বয়স্ক ওপরওয়ালাকে টপ্‌কে মামার প্রমোশন হল।

এবার কলেজের পড়া শেষ হল, ইউনিভার্সিটিতে যাব। হঠাৎ মার এস্ ও এস্ — এক্ষুনি বাড়ি চলে এস। শুনলাম মামা বিয়ে করেছেন। বিরাট সারপ্রাইজ। তাই সবাইমিলে একটা সারপ্রাইজ পার্টি দেওয়া হচ্ছে। মামীকে দেখতে পেলাম না। একপ্লেট খাবার নিয়ে বসে খাচ্ছি এমন সময়ে একজন ঘোমটা পরা মহিলা পাশ দিয়ে চলে গেলেন। মনে হল যেন আমার কাঁধে একটা ঠেলা দিয়ে গেলেন। নিশ্চয়ই চেনা কেউ হবে তাই উঠে ভদ্রমহিলার পিছু নিলাম। হাওয়ায় মাথার ঘোমটা একটু সরে গেল। মনে হল যেন একে চিনি। এবার ঘুরে মুখোমুখি দাঁড়ালাম। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাতেই প্রবল হাসিতে ফেটে পড়লাম। আরে, এ যে সলিলা !

মামাকে জেরা করলাম, 'হঠাৎ ওকে বিয়ে করলে কেন ?' মামা বললেন, 'হঠাৎ কোথায় ? এ তো গ্র্যাজুয়াল ! বলি, সিনেমার টিকিট, রেষ্টুরেন্টে খাওয়ানো, প্যাকেটে প্যাকেটে জিনিষ দেওয়া সে কি ওমনি, ওমনি ? এ দাদন, বুঝলি ?'

সাম্বার দেশে পঞ্চবলয়

সুজয় দত্ত, Cleveland, USA

ধরুন আপনাদের পারিবারিক দুর্গাপুজোটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এক-এক বছর পরিবারের এক-এক সদস্যের বাড়ীতে হয়। এবার আপনার পালা। সবাইকে নিমন্ত্রণ করা হয়ে গেছে, ষোড়শোপচারে পুজোর আয়োজনও শুরু হয়ে গেছে। এমন সময়ে আপনার ব্যবসায় নেমে এল মন্দা, বিরাট আর্থিক ক্ষতি হল। আপনার স্ত্রী হঠাৎ অফিসে কী একটা গন্ডগোলে জড়িয়ে পড়ায় তাঁরও চাকরি যায়-যায়। আর গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো বাড়ীতে একের পর এক অজানা ভাইরাল জ্বরে আক্রান্ত হয়ে সবাই নাজেহাল। কিন্তু পুজো তো বাতিল করা যাবেনা, যেভাবেই হোক উতরে দিতে হবে। নাহলে সকলের কাছে মুখরক্ষা হবে কী করে? তাই একটা মরিয়া চেষ্টা করলেন, কিন্তু টুকটাক অব্যবস্থা ঢেকে রাখা গেল না। পঞ্চমীর রাতেও প্রতিমা সাজানো শেষ হয়নি, পুজোর ঘরে নতুন রঙের প্রলেপ রয়েছে অসম্পূর্ণ, আল্পনাও জায়গায় জায়গায় আধাখেঁচড়া।

অনেকটা এইরকম পরিস্থিতিতেই লাতিন আমেরিকার বৃহত্তম দেশ ব্রাজিলের ছবির মতো সৈকতশহর রিও ডি জেনেইরোয় অনুষ্ঠিত হল ঊনত্রিশতম অলিম্পিক গেম্‌স্। বেশ কয়েক বছর আগে ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটি যেদিন ঘোষণা করেছিল রিও ডি জেনেইরোর নাম, গোটা দেশ আনন্দে উদ্বেল হয়ে উৎসবে মেতেছিল। মাত্র দুবছরের ব্যবধানে বিশ্বকাপ ফুটবল আর অলিম্পিক্সের আসর দেশের অনেক অভ্যন্তরীন সমস্যার (যথা প্রকট আর্থিক বৈষম্য, যুবসমাজের অপরাধপ্রবণতা ও মাদকাসক্তি, ইত্যাদি) সমাধান করে দেবে এবং আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় ব্রাজিলের মাথায় উঠবে নতুন মর্যাদা ও সম্মানের মুকুট -- এরকম একটা আশা শুধু রিওর চারধারের 'ফাবেলা'র (অর্থাৎ ঘিঞ্জি বস্তি এলাকার) গরীব মানুষের মনেই জাগেনি, ব্রাজিলের শাসক দল আর অলিম্পিক্স আয়োজক কমিটিও এটা বিশ্বাস করত। তাছাড়া BRIC গোষ্ঠীভুক্ত অন্যান্য দেশগুলোর মতো ব্রাজিলের অর্থনীতিও তখন রমরম করে এগোচ্ছে। তাই দক্ষিণ আমেরিকার প্রথম দেশ হিসাবে অলিম্পিক্সের মতো বিশাল ক্রীড়াযজ্ঞের আয়োজনের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেওয়ার সাহসী প্রস্তাব রেখেছিল। তখন কি আর জানত অলিম্পিক্স যত এগিয়ে আসবে ততই চতুর্দিক থেকে সমস্যা এসে টুঁটি টিপে ধরবে? প্রথমে পৃথিবীজুড়ে খনিজ তেলের দাম হু হু করে পড়ে যাওয়ায় রাষ্ট্রায়ত্ত পেট্রোলিয়াম সংস্থা পেট্রোব্রাস্ গভীর আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হল। প্রায় একই সময়ে BRIC গোষ্ঠীর অঘোষিত নেতা চীনের অর্থনীতির অবিশ্বাস্য হারে কলেবরবৃদ্ধি কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ল এবং ইউরোপে গ্রীসের দেউলিয়া হয়ে যাওয়া ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে টানাপোড়েনের দরুণ অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার ফলে সেখানেও আংশিক মন্দা দেখা দিল। স্বাভাবিকভাবেই ঐসব জায়গায় কাঁচামালের চাহিদা কমে যাওয়ায় ব্রাজিলের কাঁচামাল রপ্তানীর বাজার ভীষণভাবে মার খেল। দেশের অর্থনীতিতে ক্রমাগত কালো মেঘ জমতে থাকলে ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীর ওপর মানুষের অনাস্থা এমনিতেই বাড়তে থাকে। তার ওপর আবার রাষ্ট্রপতি দিলমা রুসেফের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠল, দেশের অর্থনীতির এই ক্রমবর্ধমান দুর্বলতা জনসাধারণের কাছে লুকোবার জন্য তিনি তাদের একের পর এক ভুল তথ্য দিয়েছেন, যাতে তাঁর নিজের ও তাঁর দলের জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ থাকে। রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই মিথ্যাচারের প্রতিবাদে সারা দেশ যখন ক্রমশঃ উত্তাল হয়ে উঠছে এবং বিরোধীরা তাঁর পদত্যাগ দাবী করছে, তখন একমাত্র যাঁর দিকে দিলমা রুসেফ তাকাতে পারতেন পরিত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য, সেই প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি (এবং তাঁর রাজনৈতিক গুরু) লুইস্ ইনাসিও লুলা দ্য সিল্‌ভার বিরুদ্ধেও মারাত্মক অভিযোগ উঠল পেট্রোব্রাস্-এর কী এক আর্থিক কেলেংকারিতে জড়িয়ে পড়ার। এহেন পরিস্থিতিতে হঠাৎ কোথাও কিছু নেই, দলে দলে অন্তঃসত্ত্বা মহিলারা বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম দিতে শুরু করলেন যাদের মাথাটা অস্বাভাবিক রকম ছোট আর মস্তিষ্ক অবিকশিত। এমনিতে সারা পৃথিবীতে এই 'মাইক্রোসেফালি' এতই বিরল একটি রোগ যে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা এ নিয়ে গবেষণায় অর্থ ও সময়

খরচ করাটা কতটা যুক্তিযুক্ত সে-ব্যাপারে সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু অল্প কয়েক মাসে ব্রাজিলে এতগুলো মাইক্রোসেফালির ঘটনা দেখে বিজ্ঞানীমহল যখন নড়েচড়ে বসলেন, ততক্ষণে একটু দেরী হয়ে গেছে। ইতিমধ্যেই বহু ব্রাজিলীয় মায়ের কপাল পুড়েছে। অবশেষে যখন এডিস্ ঈজিপ্টাই নামক এক প্রজাতির জীবাণুবাহী মশার কামড় থেকে ছড়িয়ে পড়া 'জিকাভাইরাস'-এর সংক্রমণই যে এই অদ্ভুত রোগের কারণ - সেকথা জানা গেল, তখন তো মাথায় হাত। এদিকে অলিম্পিক্স শিরে সংক্রান্তি, ওদিকে ভাইরাসের ভয়ে দেশবিদেশের দর্শক মায় খেলোয়াড়রা অবধি ওদেশে যাওয়ার ব্যাপারে দ্বিধান্বিত। তাঁদের এবং জনসাধারণের ভয় ভাঙাতে দেশের কতৃপক্ষ অতঃপর শুরু করলেন মশকনিধন যজ্ঞ। দেশের জিকা-আক্রান্ত অঞ্চলগুলিতে সেনাবাহিনী নামিয়ে জরুরীভিত্তিতে লার্ভিসাইড স্প্রে করা চলল দিনের পর দিন। জনসাধারণকে নির্দেশ দেওয়া হল পতঙ্গবিকর্ষক (ইনসেক্ট রিপেল্যান্ট) মলম মাখতে। এমনকী জিকা সংক্রমণ পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসার আগে যুবতীদের গর্ভধারণের সিদ্ধান্ত অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে দেওয়ার কথাও ভেবে দেখতে বলা হল। এই ডামাডোলের মধ্যে কি আর খেলার আসর আয়োজনে মনপ্রাণ ঢেলে দেওয়া যায়? অলিম্পিক্স-সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্প শেষ করার সময়সীমা নিয়ে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটিকে দেওয়া কথার খেলাপ করতে শুরু করল ব্রাজিলের আয়োজক কমিটি। আজ একটা নির্মীয়মান স্টেডিয়ামের ছাদ ভেঙে পড়ে তো কাল দেখা যায় অলিম্পিক ভিলেজে যাওয়ার রাস্তা তৈরীর কাজ হতাশাজনকভাবে পিছিয়ে। রোয়িং এবং আরো কয়েকটি জলক্রীড়া যেখানে হওয়ার কথা, সেই গুয়ানাবারা বে-তে অলিম্পিক্স শুরুর মাসখানেক আগেও জলে জীবাণু কিলবিল করছে, মানুষের বর্জ্যপদার্থ ভেসে বেড়াচ্ছে। প্রতিযোগীরা মেডেল জেতার চিন্তা ছেড়ে সুস্থ শরীরে ফিরতে পারবেন কিনা রিও থেকে - সেই নিয়ে ভাবিত। আমরা ভারতীয়রা আয়োজক দেশের এই অপ্রস্তুত অবস্থাটা ভালই উপলব্ধি করতে পারব, যদি সাম্প্রতিক এক কমন্ওয়েল্থ্ গেম্সের কথা মনে করি, যা দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তার উদ্বোধনের অল্প কয়েকদিন আগেও গেম্স্ ভিলেজের জায়গায় জায়গায় প্লাম্বিং-এর কাজ অসমাপ্ত, কোথাও বা চুনকাম করা বাকি, কোথাও আবার পাল্লাহীন জানলা-দরজা দিয়ে ঢোকা কুকুর-বেড়ালের পায়ের ছাপ বিছানার তোষকে। আন্তর্জাতিক মিডিয়া এসব ফলাও করে ছেপে উদ্যোক্তা দেশ হিসাবে ভারতের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছিল। এবারেও রিও-র অব্যবস্থা নিয়ে মিডিয়ার প্রচারে সবার মনে সংশয় দানা বাঁধছিল - ব্রাজিল পারবে তো?

উত্তরটা এখন আমাদের জানা। ব্রাজিল শুধু পারেই নি, এই শতাব্দীর অন্যতম স্মরণীয় অলিম্পিক গেম্স্ উপহার দিয়েছে বিশ্বকে। কোপাকাবানা আর ইপানেমার শহর রিও, কর্কোবাদো আর পাও আসুকারের শহর রিও, সাম্বা আর কার্নিভালের শহর রিও এখন থেকে পরিচিত হবে একটি দুর্দান্ত অলিম্পিক্সের অনুষ্ঠানমঞ্চ হিসাবেও। ঠিক কী কী কারণে ক্রীড়ামোদীদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে রিও অলিম্পিক্স? আমেরিকানরা মনে রাখবেন তাঁদের রেকর্ড মোট পদকসংখ্যার জন্য (১২১), ব্রিটিশরা মনে রাখবেন দীর্ঘদিনের চীনা প্রাধান্যের অবসান ঘটিয়ে একটি ইউরোপীয় দেশ হিসাবে মোট পদকসংখ্যায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসার জন্য, রাশিয়ানরা মনে রাখবেন প্রতিযোগিতা শুরুর আগেই ডোপিং কেলেংকারিতে ফেঁসে তাঁদের একগুচ্ছ অ্যাথলিট সাস্পেন্ড্ হওয়া সত্ত্বেও পদকতালিকায় তাঁদের সম্মানজনক অবস্থানের জন্য, আর ফুটবল-পাগল ব্রাজিল মনের মণিকোঠায় রেখে দেবে দু-বছর আগের বিশ্বকাপে জার্মানীর হাতে ৭-১ কচুকাটা হওয়ার লজ্জা মুছে সেই জার্মানীকেই হারিয়ে সোনা জেতার মধুর স্মৃতি। আর ব্যক্তিগত সাফল্যের নিরিখে? প্রথমেই বলতে হয় আমেরিকার কিংবদন্তী সাঁতারু মাইকেল ফেল্প্সের কথা, যাঁর এটা ছিল পঞ্চম এবং শেষ অলিম্পিক্স। পাঁচটা সোনা আর একটা রূপো জিতে শুধু বিদায়লগ্নকেই অবিস্মরণীয় করে রাখলেন না, অলিম্পিক গেম্সের ইতিহাসে ঠাঁই করে নিলেন ষোল বছরে তেইশটি সোনা সহ মোট আঠাশটি পদক জিতে, যা আর অন্য কোনো খেলায় কেউ কখনো করতে পারেনি। তারপরেই বলতে হয় আরেক বিদায়ীর কথা। ২০০৮-এ বেইজিং আর ২০১২ তে লন্ডন অলিম্পিক্সে যাঁর বিদ্যুৎগতি দৌড়ের ট্র্যাকে আগুন ছুটিয়েছিল, সেই উসেইন্ বোল্ট্ ক্যারিবিয়ান সাগরের দ্বীপরাষ্ট্র জামাইকাকে আরো তিনটি সোনা উপহার দিলেন অবসর নেওয়ার আগে। ১০০ মিটার, ২০০ মিটার আর ৪০০ মিটার দৌড়ে। শেষেরটা ছিল রিলে দৌড়, যাতে স্বদেশের আসাফা পাওয়েল্, ইয়োহান্ ব্লেক্ আর নিকেল্ অ্যাশ্মীডের সঙ্গে দৌড়ে সাড়ে

সাঁইত্রিশ সেকেন্ডরও কম সময়ে শেষ করেন তিনি। পরপর তিনটি অলিম্পিক্সের আসরে এই তিনটি ইভেন্টে সোনা জেতার 'ট্রিপ্‌ল্‌ ট্রিপ্‌ল্‌' তাঁকেও বিশ্বক্রীড়ার ইতিহাসে পাকাপাকিভাবে জায়গা করে দিল। আর মেয়েদের জিম্‌ন্যাস্টিক্সে দুনিয়ার ক্রীড়াপ্রেমীদের হৃদয় জয় করে নিল আমেরিকার ছোটখাটো চেহারার এক টিন্‌-এজার। উনিশ বছর বয়সী, চার ফুট নয় ইঞ্চির সিমোন্‌ বাইল্‌সের প্রথম অলিম্পিক্সেই পাঁচটি সোনা আমেরিকার তথা বিশ্বের ক্রীড়ামহলে এক সাড়াজাগানো ঘটনা। একটা ইন্টারভিউয়ে সে বলেছে নিজের ইভেন্টগুলো সফলভাবে শেষ করার পরে সে নাকি ফেল্‌প্‌স্‌ আর বোল্টের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল সেল্‌ফি তুলবে বলে। দুঃখের বিষয়, 'তোমার হল শুরু, আমার হল সারা' গানটা ফেল্‌প্‌স্‌ বা বোল্টের জানা ছিলনা।

রিও অলিম্পিক্সে ভারতও এক অভূতপূর্ব কান্ড ঘটিয়েছে। প্রতিযোগী আর কর্মকর্তা মিলিয়ে বিরাট একটি দল ব্রাজিল গিয়েছিল ভারত থেকে, যা এখনও অবধি ভারতের অলিম্পিক্সে অংশগ্রহণের ইতিহাসে বৃহত্তম। চার বছর আগে লন্ডনে সবমিলিয়ে ছটা পদক পাওয়ায় ভারতীয় অলিম্পিক কমিটি নিশ্চয়ই ভেবেছিল এবার প্রতিযোগীর সংখ্যা বাড়ালে পদকের সংখ্যাও বাড়বে বই কমবে না। কিন্তু হায়, সে-গুড়ে বালি। প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার অল্প কয়েকদিন আগেও ভারতের ঝুলি ছিল শূন্য। তারপর মেয়েদের কুস্তিতে হরিয়ানার সাক্ষী মালিক ব্রোঞ্জ জিতে সে-খরা কাটান আর হায়দরাবাদের পুসারলা বেঙ্কট সিন্ধু ব্যাড্‌মিন্টনে মেয়েদের সিঙ্গল্‌সের সেমিফাইনালে রোমহর্ষক জয় ছিনিয়ে নিয়ে একদিনের জন্য একশো কুড়ি কোটি ভারতবাসীকে সোনার স্বপ্ন দেখার সুযোগ করে দেন। কিন্তু শেষ অবধি সে-স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায় ফাইনালে সিন্ধু কার্যতঃ আত্মসমর্পণ করায়। এর আগে কোটি কোটি ভারতবাসীকে কাঁদিয়ে ত্রিপুরার বাঙালী মেয়ে দীপা কর্মকার জিম্‌ন্যাস্টিক্সে ভল্টের ফাইনালে একটুর জন্য ব্রোঞ্জ ফস্কে চতুর্থ হন এবং শ্যুটিং-এ লন্ডনের সোনাজয়ী অভিনব বিন্দ্রাও অল্পের জন্য ব্রোঞ্জ হাতছাড়া করেন। তবে প্রথম ভারতীয় জিমন্যাস্ট হিসাবে অলিম্পিক্সের ফাইনাল রাউন্ডে ওঠার কৃতিত্ব দীপার কাছ থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। আন্তর্জাতিক ক্রীড়ার সর্বোচ্চ আসরে ভারতীয় অ্যাথ্‌লিট্‌দের চতুর্থ হওয়ার 'সেই ট্র্যাডিশন্‌ সমানে চলিতেছে'। মিল্‌খা সিং, পি টি উষার পর এবার দীপা আর অভিনব। এঁরা ছাড়া ভারতের বিশাল দলের আর কেউই আশা জাগানোর মত লড়াই দিতে পারেননি। টেনিসে লিয়েন্ডার পেজ (যাঁর এটা ছিল সপ্তম এবং সম্ভবতঃ শেষ অলিম্পিক্স) আর রোহন বোপান্না, মেয়েদের টেনিসে সানিয়া মির্জা, ব্যাড্‌মিন্টনে সাইনা নেহ্‌ওয়াল, শ্যুটিং-এ গগন নারাং ও প্রকাশ নানজাপ্পা, মহিলাদের শ্যুটিং-এ জিতু রাই, দৌড়ে হিনা সাধু, তীরন্দাজিতে দীপিকা কুমারী ও লক্ষ্মীরাণী মাঝি, ভারোত্তোলনে সাইখম চানু - কেউই পদকের ধারেকাছেও আসতে পারেননি। কারুর অজুহাত চোট-আঘাত, কারুর প্রতিযোগিতা শুরুর মাত্র দুদিন আগে রিওতে আসায় বেশী অনুশীলনের সুযোগ না পাওয়া, কারুর আবার রিওর জোরালো সামুদ্রিক হাওয়া সামলাতে না পারা। দলগত খেলাতেও পুরুষ ও মহিলা হকি দল চূড়ান্ত ব্যর্থ। স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে যাচ্ছে ভারতীয় খেলোয়াড়দের অলিম্পিক্সের যোগ্যতামান নির্ধারণের প্রক্রিয়াটি নিয়ে। ন্যূনতম যোগ্যতামান পেরোলেই কি তাকে অলিম্পিক্সে যাওয়ার ছাড়পত্র দেওয়া উচিত ? ভারতীয় ক্রীড়াবিদ্‌দের ব্যর্থতা নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে সংবাদ-শিরোনামে চলে আসেন লেখিকা শোভা দে। উনি বলেছিলেন ভারতীয় খেলোয়াড়রা রিও গেছেন বেড়াতে, সেল্‌ফি তুলতে আর সরকারের কোটি কোটি টাকা জলাঞ্জলি দিতে। তাঁর মন্তব্য নিয়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠলেও পদকতালিকার দিকে তাকালে তাঁর কথা উড়িয়ে দেওয়ার আর উপায় থাকেনা। এখন আবার সুদীর্ঘ অপেক্ষার শুরু - টোকিও অলিম্পিক্সের দিকে তাকিয়ে, নতুন আশায় বুক বেঁধে। কে জানে, সেখানে হয়তো শোভা দে ভুল প্রমাণিত হবেন।

লিমেরিক

শুভ্র দত্ত, Seattle, USA

তর্কের খাতিরেই এটা ধরা যাক তো
এক্সপিরেশন ডেট যদি লেখা থাকতো
বিষের শিশি লেবেলে;
সেই ডেট চলে গেলে
সে বিষ কি হত বেশী না কম বিষাক্ত ?!

**** **** **** ****

'পন্ডিত' রবি শঙ্কর আর 'ওস্তাদ' আলি আকবরে
হিন্দু এবং মুসলমান তো চিহ্নিত করে রাখব রে
যদি তবে কোনো গুণী খৃষ্টান
সেতার অথবা সরোদ বাজান
হবে কি তখন মন আনঞ্জান, তাঁকে কিবা নামে ডাকব রে?

**** **** **** ****

(ভাবী) সীতা তো থাকবে ঘরে পুরো একা একা
(তাই) লক্ষ্মণ এঁকে দিল লক্ষ্মণরেখা
(হায়) বাঁকা বাণ ছিল তূণে
(ফলে) তা দিয়ে আঁকার গুণে
(শেষে) সে রেখাটা হয়ে গেল ভারি আঁকাবাঁকা ।

**** **** **** ****

দৃষ্টিহীনের স্কন্ধে খঞ্জ (কানার ওপরে খোঁড়া)
পরস্পরের সাহায্যে বেশ চলত ফিরত ওরা
রাজা বললেন, 'তবে এইবারে
অন্ধ চড়ুক খঞ্জে ঘাড়ে'
দেখে সুবিচারে অভিভূত সব প্রজা ও আমাত্যরা ।

'অলৌকিক', সে ঘটে তো বটেই, ঘটেছে তো বারে বারে
তবে কিনা, তার ঘটা কমেছিল ক্যামেরা আবিষ্কারে
তবু, বিনা সে অলৌকিকে
জীবনের রং ফিকে
(তাই) ইদানিং কালে ফটোসপ ফের ফিরিয়ে এনেছে তারে ।

**** **** **** ****

কতই কেতায় বাজায় বাঁশি পাশের পাড়ার কানাই
সারে-গামা-পাধা-নি এই সাত স্বর তার জানাই
বানালো এক অদ্ভূত রাগ
পা ও ধা বর্জিত বেহাগ
নাম সে রাগের কি দেওয়া যায় ? দিল 'ধানাইপানাই' ।

**** **** **** ****

'কুমোর পাড়ার গরুর গাড়ি, বোঝাই করা কলসি হাঁড়ি'
একশো বছর কাটিয়ে এবার নাও যদি খোঁজ আবার তারই
গরুর গাড়ি কোথায় উধাও
মাটির জিনিস, বিকোয় না তাও
(তবে) অনলাইনে করছে আলো ট্রাডিশনাল ফোক পটারি ।

একটি প্রহর

মহম্মদ শাহরিয়ার

তোমাকে পাবনা জানি
নাইবা পেলাম
শুধু একটি প্রহর – শুধু একটি প্রহর;
শুধু তুমি, শুধু আমি, হতে পারে নাকি ?
বেঁচে নেব আমি তাতে হাজার বছর ।
তোমাকে পাবনা জানি
নাইবা পেলেম –
জৈষ্ঠের খরতাপে ধুলি ওড়া পথে হেঁটে
পিঠে পিঠ হেলান দিয়ে, বটের ছায়ায় বসা – একটি প্রহর ।
স্বর্গের দ্বার খুলে বেখেয়ালে যে বাতাস
খেলে খেলে যায় এ ধরায় ।
সে বাতাস ছুঁয়ে যাবে আমাদের দেহ ।
তখন যে সুরে কাঁপে তোমার অধর –
সেই সুর কানে ধরে, পার করে দেব যত
আষাঢ় ভাদর ।
পৌষের হিম শীতে ঘন কুয়াশার এক রাতে
উঠোনের এক কোন, উনুনের পাশে বসা – একটি প্রহর ।
আগুনের যেই রঙ্গে মিশে থাকে শুধু প্রেম
মিশে থাকে খুব ভালবাসা –
সেই রং ছুঁয়ে যাবে আমাদের মন ।
তখন যে গান তুমি গাবে গুন গুন
সেই গান প্রাণে ধরে, পার করে দেব শত
শরৎ ফাগুন ।

Editorial

Leaves and Pages

Welcome to the fall 2016 issue of *Batayan*! When summer ends, I always miss the long, sunny days, swimming in Lake Michigan at the Chicago beaches and enjoying the outdoor street festivals and parades.

But autumn has its own appeal with the start of a new school year, the soft smell of bonfires and leaves turning gold, red and purple. No matter how autumn arrives in your home, the shorter cooler days offer one more reason to stay in with a good book, like an Agatha Christie mystery or a new poetry chapbook like Viola Lee's Lightening after the echo, both reviewed in this issue. Share the connection to books and other readers' lives in Rochelle Wooding's *I Cannot Live Without Books* and Lew Rosenbaum's *We are all Related.*

Autumn is also a season for travel and visiting family. Share Erin Nichols' journey into Australia's wine region in *The Great Southern Wine Festival* or Shreya Datta's family homecoming *To Grandmother's House.*

We hope you enjoy the fall issue of *Batayan.* Thank you for sharing these stories.

Jill Charles
Chicago, USA

I Cannot Live Without Books

Rochelle George Wooding

" I cannot live without books!"

— Mark Twain

Have you ever smelled the pages of a newly printed book? It is similar to smelling a new baby just after it has been brought home by his parents and lathered with baby oil and baby powder. There is a distinct fragrance of paper and ink that makes you smile. Why? Maybe you are the first person to touch that book after it was born, I mean printed and distributed in a school library. I caught one of my students sighing and placing a book on his cheek. I inquired what he was doing. He said, "My favorite book! I loved this book so much when I was younger." Just smiled at him and thought to myself, this why I am a librarian! I want to give my students the experience of loving books and the absolute joy of reading a book.

THERE IS NOTHING LIKE A NEW BOOK, OR AN OLD BOOK THAT YOU HAVE BEEN LOOKING AROUND THE LIBRARY, HOME, OR ELSEWHERE TO PURCHASE. IT MAKES ME SMILE WHEN YOU FIND IT, AND I YOU DON'T BELIEVE ME, CHECK Your FACIAL EXPRESSION WHEN YOU FIND, AND TOUCH THE BOOK YOU LOVE AND FINALLY LOCATED.

A librarian who loves books and the students and/or patrons can see examples of books and what they do to a reader. I would share with the students that sometimes I would have three different books I read at my home. One would be in the living room by my big chair; one in the bedroom near my table lamp, and my Bible/Daily Bread in my purse.

My love of books extends to the new and the old. I have my books from an early age that brought me smiles and laughs. My books are a treasure that I value. I can remember the title of a book that I read in the 4th grade, Under This Roof. I told myself at the age of 9 that I would never forget the title. It gave me such a picture of family and what one member of the family could do to keep the family together. The main character, the older sister of three, worked so hard to keep her family afloat during a hard winter season, she had me mesmerized with her abilities. Books have taught me how to live in this world and appreciate my family. Books have allowed me to learn a language, visit countries through, and enjoy a good mystery.

My autographed books by the author are my treasure too. I remember making my way to the bookstore on 52nd Street and Lake Park, to listen to Terry McMillan read, Waiting to Exhale. Hearing the author read their written words was a thrill. I waited in line to have the book signed, but my legs gave out. During my tenure as a librarian, I attended many meetings, workshops, and conventions where I met many authors and did get an autographed book**.** The Watsons go to Birmingham**,** Bud not Buddy**,** Newberry Book winners, by Christopher Curtis, Chicago Haunts and More Chicago Haunts, by Ursula Bielski, just a few of the many autographed books I have in my home library. One book Chicago in 2010 featured, A Mercy by Toni Morrison the renowned African-American author and the first 100 people got a free book. Also, there was a free meet and hear from the author at the Auditorium Theater. I stood in line for both events and did receive a copy of her book. If it were not for friends that got to the theater earlier than I did, I would not have been able to get a seat. My biggest coupe was in Cleveland, Ohio at the Cuyahoga Community College at the downtown campus where the author of Roots, Alex Haley, was introducing his book. I saw, listened, and asked a question. This was before the movie. I was a beginning high school English teacher in a school where desegregation of schools began with the teachers in about 1971. I had most of my students ready to go to Africa with my enthusiasm. We also read, Things Fall Apart and No longer at Ease, by a Nigerian author, Chinua Achebe. I wonder if any of them have traveled to Africa?

I continue to make it to book readings and signings in an effort to purchase the book, newly printed, and see the author. Some authors do not match your musings. One of the readings that we had with old writing groups at the public library was the time someone asked me to sign my submission.

Yes, I cannot live without books and if you visit my home, the most items I have are books on paintings and books on living better and longer, and volumes of books on every subject.

Agatha Christie: Queen of Mystery

Jill Charles, Chicago, USA

"Very few of us are what we seem," said Agatha Christie. How did an unassuming lady from a southern English village become the best selling mystery writer of all time?

Born on September 15 1890, Agatha grew up in the seaside town of Torquay in Devonshire. Home schooled by her mother, who encouraged her to write, Agatha was always creative. She loved to act out stories as a child and first attended school in Paris at age 16.

On the eve of World War I, Agatha married Archibald Christie, a Royal Air Force pilot. During the war Archie was stationed in France while Agatha volunteered as a nurse in a military hospital. Their daughter Rosalind was born in 1919.

Agatha wrote her first book during World War I and published it in 1920. A murder mystery about a rich heiress, The Mysterious Affair at Styles was well-received. It introduced one of her most famous characters, Hercule Poirot, a well-dressed detective who delights in catching criminals before the police and flaunting his intellect. Meeting with Belgian refugees after WWI inspired her to make her bold detective Poirot a Belgian.

In 1926, Archie became involved with another woman and asked Agatha for a divorce. Heartbroken, she ran away for 11 days and was found checked into a hotel under the other woman's name. The Christies divorced in 1928 with Agatha keeping custody of Rosalind and use of the Christie name for her publications. As always she persevered in her writing with a successful novel in 1930. Murder at the Vicarage featured Miss Jane Marple an elderly spinster with surprising detective skills.

Miss Jane Marple, a modest English spinster from a country town, uses her powers of observation and friendship with retired policeman Sir Henry Clithering to solve murder cases. "Miss Marple was based on my step grandmother, or my aunt [Margaret West], and her cronies old ladies whom I have met in so many villages where I have gone to stay as a girl," said Agatha Christie.

Agatha remarried in 1930 to Sir Max Mallowan, an archaeologist. Traveling with him on archaeology digs, she visited Baghdad, Egypt and Istanbul. Happily married to Mallowan for the rest of her life, she remarked "An archaeologist is the best husband a woman can have. The older she is, the more interested he is in her." Settings such as India and Egypt would become the backdrops of her famous books Murder on the Orient Express and Death on the Nile.

She wrote 66 mystery novels, and is the third best selling author of all time, with her books ranking after Shakespeare and the Bible. Her novels have sold roughly 2 billion copies and been translated into 103 languages. Agatha's best selling novel, with 1 billion sold, is And Then There Were None a mystery about ten people lured to an island to be punished for murders they committed.

Besides her mystery novels, Agatha wrote six romance novels under the name Mary Westmacott and several plays. "Writing plays is more fun than writing a book," she said. "You don't have to bother with long descriptions of places and people." Her most successful drama "The Mousetrap," broke records as the longest running play ever. It opened in the West End of London in 1952, and has been running continuously since then. Not surprisingly, it is a murder mystery.

In 1971, Agatha Christie received the honorary title of dame from Queen Elizabeth II for her contributions to English literature. She died on January 12, 1976 at age 85 from natural causes at her home in Winterbrook, Cholsey. She is buried in the nearby churchyard of St. Mary's in Cholsey sharing a headstone with her husband Max.

Forty years after her death, Agatha's thrilling mysteries, witty plays, engaging characters and clever insights into human nature remain in her books, dramas and numerous film versions of her work. Like all of us readers, she was much more than she seemed.

Mahishasura

Souvik Dutta, Chicago, USA

16th February 1901 witnessed the birth of a man who would change the trend of human history. John Rex Whinfield was born in Sutton, Surrey, England and from his very childhood showed deep interest in natural sciences and chemistry. Eventually in 1941, after years of research, Whinfield along with his fellow chemist James Tennant Dickson gave the world Terylene, the first polyester fiber. The scientific community named it PET, Polyethylene terephthalate.

10 years younger to Whinfield was Nathaniel C. Wyeth. Wyeth, an American mechanical engineer and inventor, experimented with PET and finally made it into bottles which could withstand the pressure of carbonated liquids. This work, patented in 1973, made bottles made of recyclable PET plastic created a revolution world-wide. These apparently indestructible, completely recyclable bottles were lighter than glass and virtually unbreakable. The world finally had its plastic soda bottles.

PET bottles or known as plastic bottles took over the world. These bottles became the most popular storage for food and drinks. The bottles were lightweight, had low production and transportation costs compared with glass bottles and thus the favorite of almost all manufacturers and consumers alike.

However, this boon to humanity soon started showing its negative side effects on the masses. Toxicity and environmental issues of plastic soon became a matter of concern over some quarters of the world. Whereas numerous independent research hinted at the use of PET plastic for food causes various aliments in humanity – like cancer and infertility, most international and national regulatory bodies did not pay much attention to it. Only as recent as January 2010, in the United States, the FDA admitted to the health risks associated with the use of PET bottles. Today, it is a known fact that repeated use of PET bottles under varying temperatures can interfere with the food it holds and cause abnormalities in the body of those who consume it.

The next issue that the world faced was the apparent immortality of PET. PET degrades very slowly. Since the 1950s, one billion tons of plastic have been discarded and some of that material might persist for centuries or much longer. In 2009, it was estimated that 10% of modern waste was plastics, although estimates vary according to region. Meanwhile, 50-80% of debris in marine areas is plastic. This waste which is almost non-degradable imposes huge threat to all life on earth.

Very recently, in 2016, something remarkable was discovered - Ideonellasakaiensis. Ideonella-sakaiensisis a bacterium from the genus Ideonella, capable of breaking down PET plastic. Ideonella-sakaiensis was identified in 2016 by a team of researchers from Kyoto Institute of Technology and Keio University. Nature found a way to deal with a problem that was going to pose a threat to all life-forms on the planet. Without this bacterium, because of PET's resistance to degradation, there have been no real strategies available to scientists to develop a viable remediation or recycling strategy. The team of researchers who discovered the bacterium is still baffled as to where these bacteria came from.

However, the battle between nature and man's invention won't be an easy one. PET bottles are made with highly crystallized PET which would still take the bacteria a long time to eat away. This battle still continues.

Sanatan Dharma is called so because the ideas presented in it are Sanatan (timeless). In a portion of Markendaya Purana is a story of Devi Durga and Mahishashura. The Devi Mahatmya, literally "glorification or praises of the Goddess", constitutes chapters 81 to 93 of the Markandeya Purana. Devi Mahatmyam is also known as the DurgāSaptashatī (दुर्गासप्तशती) or Caṇḍīpāṭha (चण्डीपाठः). The text contains 700 verses arranged into 13 chapters. The chapters are also classified into 3 primary episodes – Madhu Kaitabha Vadha, Mahishashura Vadha, Shumbha Nishumbha Vadha.

Being born in Kolkata, Durga Pujo was at the epitome of festivity in the year. The image of the

Madhya Charitam of Devi Mahatmyam, that of Devi Durga piercing the chest of Mahishasura was the most common image of festival worshiped and celebrated with pomp and grandeur in every corner of the city. Being a curious child, I was intrigued by the image of a muscular man at the feet of a ten-armed lady who was smiling as if the killing was effortless. My interest grew and I studied the story deeply. As it often happens in life, the same story had different appeal to me in different stages of my mental maturity. In this article, I wish to draw the parallels to the story of plastic and that of Mahishashura.

Brahma is said to be the intellect. So sharp that just one head was not enough and yet not complete enough to hold 5 heads like Shiva. Brahma gives a boon to Mahishashura by which he will be invincible with only one minor clause; he can only die at the hand of Prakriti.

In Devi Suktam, we find a verse which reads –

या देवी सर्वभुतेषु जाति रूपेण संस्थिता ।

Yaa Devii Sarva-Bhutessu Jaati-Ruupenna Samsthitaa |

नम स्तस्यै नम स्तस्यै नम स्तस्यै नमोनमः ॥१५॥

Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namas-Tasyai NamoNamah ||15||

~ Verse 15, Devi Suktam

Science has confirmed that the only those jaatis (or species) can survive or sustain on this planet which have a stable reproducing female version of that species. Prakriti's language is very subtle but most definitely final.

For humanity, women are the most sublime manifestation of nature. Nature gives birth to life forms which in turns becomes a part of nature. Thus, throughout Sanatan Dharma, Purush and Prakriti are symbolized by man and woman.

In the story of plastic, Whinfield, Dickson, Wyeth are all manifestations of high intellect of Brahma. They give the boon of immortality to an Asura called PET plastic. PET plastic is now the invincible Mahishashura who starts controlling the planet. Devatas are forces of nature – climate, eco-system, oceans, vegetation, crops etc. Plastic starts impacting nature, life forms die, humans become sick. Soon, the asura (plastic) brings out ignorance and greed in humanity so much so that humans succumb to its "productivity" and in turn accept its "negativity".

Devatas are helpless and they reach out to Prakriti to find a solution to defeat this demon. Prakriti evolves into something that makes the asura its food, there by killing it and freeing the Devatas from the agony of the demon.

However, what was the Asura? Is it fair to call PET plastic the Asura? Is Brahm's boon really to be blamed in this case? Instead was it the human greed to make more profit and gain more control the real demon? It is easy to separate ourselves from the process of this story and view it as a reader but that would be a demonstration of extreme escapism.

The battle between human greed and nature is nothing new and it is not only the story of plastic. When we pick up the flowers for pushpanjali for the Devi from a plastic bag to offer to the goddess, I think it is time we question ourselves – on those side are we fighting the battle – Mahishashura or his Mardini.

Communication of the Self

Allen F. McNair

There is a place where I like to go
Deep within my mind and heart.
It is a place of unbounded bliss
Which I enjoy relating to others.

An unlimited reservoir of creativity.
It allows me great wisdom to express
To others about life's experiences.
I am able to tap it twice-daily.

Ideas effortless bubble up within.
My writing and illustrations grow
Inside my head, capable of fruition.
I am soon in the zone of productivity.

When I go beyond my thoughts
I experience something greater
Than the mental sum of my parts.
It is a field of all possibilities.

The deep-rooted stresses just melt away.
My mind is then freer than the wind.
Many of the poems I write provide
New insights into others' character.

The feelings and thoughts of each poem
Reach universal truths in my constant
Effortless communication of the Self.
Without poetry, I could not communicate.

Just a few words of title or theme rapidly
Expand to complete stories in poetry.
I am able to paint solid word-pictures
That have been transformed to artworks.

The energy expended in telling these stories
Is really quite minimal to my versatile mind.
Going to my place of rest and tranquility
Transforms the individual self to cosmic Self.

The Self is all there is within each person.
Anyone has access to this infinite Self.
I have had this experience for over forty years
Since instructed in Transcendental Meditation.

Poetry is the universal expression of one's thoughts.
Its great importance is very real, especially to me.
Individual pieces about homelessness and its adventures
Have progressed into an epic poem set in the future.

My mind and heart have also grown apace.
Poetry has given me a voice to be heard.
My own world is a better place originating
From thoughts and progressing into words.

My wish to be self-published has borne fruit
My epic poem, *I Dream of A'maresh*, has
Taken root in the minds of many readers
Both in the recent past and soon into the future.

I look forward to telling other stories every day.
With the constant communication of the Self
There is no end to what I can express to all.
And poetry actually makes all of this come true.

You and I

Balarka Banerjee, Sydney, Australia

You and I
Were never meant to survive
You and I
Just a twinkle in some mad child's eye
Just a wisp of foam
On some foreign tide
You and I
Were never meant for this
These forms full of puss and piss
With grobs in our knobs
And knots in our spots
With joints that go creak
And knees that grow weak
Just bags of bubbly fat and meat
Bound together by an elastic sheet
With cracks that ooze
And edges that seep
Poisoned by booze
And lack of sleep
And that flowy red juice that never seems to cease
No
You and I were never meant for these.
We were two bits of dandelion
Soaring for the clouds
Two verses of secret prayer
Whispered out loud
Yet in a world that was created to die
Where all existence has no persistence
And maybe when all is gone to entropy
Maybe all that will ever be
Maybe. Just You and I.
Two lonely specks of light
I blink once for you
And you blink in reply
You and I
Will be all that survive

City of Constellations, City of River Light

Viola Lee, Chicago, USA

Let us illustrate
these lines for just a minute.
Let us go here.
Let us illustrate these lines.
To one sibling it may often mean
a room full of constellations
streams of silver light,
slender ribbon and canopy,
storyline after storyline,
migrations of others
moving towards cities with trees
and perhaps a stream
a few meters away.
For long, the bricklayer
and the woodpecker
will have lost their subtle ground.

This is the city of constellations,
city of river light,
city of these letters
city of those two, you,
near the acorns and
the familiar park bench.
Let us go back
to the constellations again
to that river of stars
to those illustrations
of what we want to see
dark , black lines across
a bright white canvas.

This contrast, always,
of what will continue
even in this light all covered in rain
even during those calm partial rotations
hours in this city, something tagged again,
boy breaking glass,
a grain, a grease catch, gasoline.

Let us go there to these constellations
those streams of light,
a floor full of still stars
and that bubble of unending need.

The most will often mean more rain
a collection of what
we will keep for ourselves
and the history of numbers
are in those constellations.

Let us go. Let us look
to the constellations again and again.
Let us be grateful for what is enough.
Let us see enough
in any public shared space,
in our constellations,
in these rivers of light.
Let us all become constellations.
Let us say these words
graciously and kindly:
river, water, constellation, light,
Let us be a part of the masses
holding up those names:
unnamed, unarmed, river,
water, constellation, light.
Let us say it again and again:
river, water, constellation, light.

We Are All Related

Lew Rosenbaum

The fall of 1985, Los Angeles, California. Bethlehem Steel had closed its doors for good. Actor/playwright Susan Franklin-Tanner was invited to the hall, where Local 1845 still held meetings, counseling sessions and conducted a food bank for the unemployed. After meeting with some of the unemployed workers, she planned to develop a coherent story of what it was like, from the inside, to experience the loss that was the promise of good industrial employment. The workers may have been unaccustomed to putting down on paper their thoughts and opinions and feelings. For some, it helped them explain what had happened to them (to themselves as much as to others). For others it was a way to deal with loss and pain. For others, it was so painful they could not stick the project out to the end.

August of the same year was the 20th anniversary of the eruption that the Otto Kerner Commission would call the L.A. Riots. On the streets of Watts, people called it a rebellion. Despite a new health center in the center of Watts, if Watts seemed different from 20 years earlier, it appeared to be even more desolate. Ground had been cleared for promised new housing. The industry that lay along the strip just east of Watts, Alameda Blvd., hung in the doldrums. Further to the east, in South Gate, the plants that had bolstered employment throughout the region were shuttered or on their way out: General Motors, Firestone, U.S. Steel.

Further to the south lay Compton, a separate municipality which vied with Watts for title of more impoverished. Compton's college offered a chance for two years of higher education to young people who had been the beneficiary of some of the worst primary and secondary schooling in the county. Michael Widener taught history to students who adored him for his energy in the face of bureaucratic obstacles and less than limited resources.

Susan Franklin-Tanner, Michael Widener, and Sue Ying Peery from Watts were people who frequented the Midnight Special Bookstore. They did not know each other. They moved in different worlds. The Midnight Special formed the locus for their interconnection. In the fall of 1985, these different worlds were connected by a remarkable medium; authors Manlio Argueta and Claribel Alegria, two writers from El Salvador, came to Los Angeles on tour for their books.

Midnight Special had for some time worked with Sandy Taylor and Judy Doyle of Curbstone Press. In 1985 they were promoting Claribel Alegria, whose Flowers From the Volcano had been published by University of Pittsburgh press. But Sandy had also published her work and was bringing Claribel to the States. He wanted to find places for her to read. How could he get a review for her books in Los Angeles? Sandy was nothing if not indefatigable. And it just so happened that Random House had recently published One Day of Life by Salvadoran novelist Manlio Argueta. (In Spanish he was best known as one of the three giants of Central American poetry). We arranged to have them come to the Midnight Special. But we had much bigger plans in mind.

We were invited into the living room of Santa Monica artist Burial Finkel to make plans. How do we get air time on public radio? How do we get the papers to pay attention? We all had some interests in common: we wanted to get an audience for the poets, and we wanted to celebrate their presence (recognize them for their accomplishments). No one had any doubt that Claribel and Manlio would read at the bookstore. That was why they were coming to Santa Monica. And we could provide not only an audience but the most respected collection of Latin American literature in the city.

Los Angeles is a big city, though. Beyond the bookstore, we had other things in mind to do. One thing we knew from previous encounters with authors and revolutionaries from other countries; their experience with the left had convinced them that America is rich and that the working class is reactionary. Both Manlio and Claribel were infused with the passion of their country's experience of oppression and revolution. We aimed to bring them

into contact with some of the festering sores we knew existed in our hometown. We knew we would have failed if, at the end of the trip, they had only read before polite and appreciative audiences and sipped wine before a sumptuous dinner in the faculty lounges of the universities.

Working with Curbstone, we arranged for the writers to lead a workshop at the Bethlehem Steel local – to exchange their poetry and writing with the writers from the "Lady Beth" group. Nestled in Maywood, at the center of working class communities – Bell, Huntington Park, Watts – Bethlehem had been a crossroads of the segregated multinational Los Angeles working class. The voices of Susan and the half dozen steel workers echoed through the otherwise empty main room of the union hall, empty except for the addition of Manlio, Claribel and me – and ghosts of hundreds of laid off steel workers. Two of the steel workers knew some Spanish, and could talk with the writers in their native tongue. Otherwise, a lot of translation flew back and forth, attempts to figure out what they each were saying.

Each read to the other and explained what they were reading about. Losing a job, losing a place to stay, losing all hope for the future: that was a language the Salvadorans recognized. The steel workers listened attentively to stories and poems of resistance in El Salvador, nodded in recognition as well. Differences of language and geography evaporated in the atmosphere of that union hall that morning.

I picked up the two writers up the next morning. I had made arrangements with Michael Widener for the writers to talk to students in two of his Compton College classes, morning and afternoon. When well-known authors come to Los Angeles, their publicists and literary agents seek opportunities to speak at universities: UCLA or USC first, the state universities next. City colleges lie far off the radar. For these Compton College students, this was a huge event, far more than I could imagine.

The morning class was informal with about 30 students, all nervous, jittery, unsure of themselves. I no longer know what they talked about. But slowly the students emerged from their shy cocoons, asked questions of their guests, discussed, along with Michael, the content of our history and their lives. The authors shared with their listeners some of their writing, and, before we all knew it, the class was over.

Then the students brought out lunch, dishes they had prepared at home and brought to share with their guests for the day, and we all feasted, talked, and broke down a few more barriers. More questions, more discussion, more ideas. What is it like to live in a society under constant bombardment? To wonder where the next meal would come from? To worry about where to sleep that night? Both the students, nearly all of whom were African-American working class, and the writers had something to contribute about this. The meal together changed the relationship from student and teacher (American and foreigner) to brother and sister.

With a couple of hours between classes, I took Sue Ying's advice. The three of us headed five miles almost due north, to the Watts Towers and the art center adjacent to it. We drove the 50 blocks toward 107th and Graham, until we saw the Towers of Simon Rodia rising in front of us. We found parking on 107th, a street lined on one side with single family homes, opposite the Towers and the art center. What are these Towers and how were they built, my guests wanted to know?

There are three major spires that form the Towers, the tallest a shade under 100 feet in height, slender spires of reinforced concrete. Walking around the cramped grounds inside the wall that Simon Rodia built to surround his grand work, it was difficult to imagine a single man, toiling 33 years, from 1921 to 1954, without any equipment other than a tile cutter and a telephone lineman's belt, using found materials from the mills and junkyards in the neighborhood. Now the Towers are listed in the Great Buildings online archive, and have been declared a National Historic Monument. Now the authorities consider Rodia an architect, his creation a monument to the soaring spirit of man. When "Sam" Rodia completed his work, few people in Los Angeles City Hall saw the Towers or its architect as great in any sense.

That afternoon we stood at the base of the Towers, admiring the many objects -pieces of plates, pop bottles, silverware, tiles - all a multicolored mosaic, embedded in the mortar and cement that surrounded the rebar skeleton of the Towers, the wall and other constructions. Their state of disrepair could not hide Rodia's soaring imagination.

We turned away from this amazing piece of work, created by a no less amazing but ordinary immigrant

worker, and drove back to the classroom at Compton College. The afternoon class, in a lecture room, provided an opportunity for Claribel and Manlio to meet other classes as well, and to give a more formal reading. They had seen a side of America they had not seen before, and were gracious in return to the students who had been so blown away by the opportunity to talk, face to face, to writers of such significance. Some bought Manlio and Claribel's books; considering the constraints on their pocketbooks that must have taken some internal persuasion for them to decide to take that step. The embraces and gleaming faces were far more important than the book sales on that day, and we all knew it.

In Watts, at the steel union hall, and in Compton Manlio and Claribel met Americans they would not have met otherwise. They saw a glimpse of another side of America, kept hidden from the rest of the world. And that side of America reached out to embrace them. I don't think I'll ever forget what Manlio said in Spanish to Claribel as they walked across the street in front of the Watts Towers, looking at porches falling down from the houses, paint peeling off the walls, one or two houses boarded up and empty, others clearly falling apart: "I didn't know people lived like this in the United States. It looks like a Third World country."

RIGOLETTO: The Curse

Tinamaria Penn, Chicago, USA

What troubles weigh upon your soul?

The uncovering of the veil must never happen
Fear of being discovered bears down hard
Like the tight shield carried close as skin
Protected from human touch
Secret features consequently dreadful
Contorted resemblance of a beast
Scarred and mangled with unconquered disgrace
Only approach while in disguise
Keeping hidden in history the origin of the curse
Real eyes reflection not seen for the filter
Making the center roughly impenetrable
Even to one who looks beyond heaviness
Offering to lighten the load
Replacing the mass with the kindness of laughter
Purpose to hold hands not only in private places
Look directly at all that is mangled
Still recognize tranquil beauty inside
Embrace in front of the universe
Breaking the curse with a gentle kiss
Caressing not only the outer countenance
Rather touching the center of life for a lifetime

Love Poem Posted on the Internet

M.C. Rydel

I have been seeing you everywhere,
Turning left on an arrow in traffic,
Training for a marathon around a tiny, windy lake,
Taking tea at a sidewalk café.
Those brown eyes and hair and white skin
Are as fresh as after a shower
And as white as your terrycloth towel
As you dry your wet hair and disrobe.
The white shoulders, breasts, stomach, and thighs
Become everything all morning into the night.

I make room for your triumphant return
By abandoning all grudges and blame.
I forgive all lost luggage and the baggage handlers who lost it.
All lost reservations and frazzled clerks
All thieves, cheaters, liars, and frauds.
I am as empty as newly built cabin
And as cluttered as a sublet in Greenwich Village.
You have been spotted by the paparazzi,
All eyelashes, bobbed hair, and smile,
And you make wherever you are into a stage.

You have become a character in a poem
Written by a character in a poem.
You exist in the “About Us” section of your theatre's web site,
In safety deposit box photographs,
In person at an airport during a weather delay,
And you want us to be young lovers again,
Who notice no one around them when they kiss,
Who stretch and yawn as they wake at noon,
Who hear phantoms in a windswept window,
And who search the net for poems posted like beacons.

To Grandmother's House

Shreya Datta (11th Grade), Cleveland, USA

Alas ends our eighteen-hour journey
Luckily the flight landed early
Searching for the luggage we stowed
To Grandmother's house we go

To navigate the narrow streets
Requires skills that only the rickshawala meets
Keeping patience as the traffic slows
To Grandmother's house we go

We catch sight of the mango trees
And don't feel as if we're overseas
Basking in the summer glow
To Grandmother's house we go

She stands at the front door
And embraces us till we can take no more
Smelling her saree's sweet lavender scent
To Grandmother's house we went

NORTH SEA JAZZ

Maureen Peifer

Rivers of music flowing into the North Sea
Blues from the Mississippi where
Afro - Cuban Arturo O'Farrill disseminates, articulates his jazz heritage
Chick Corea's piano notes in the Amazon
Earth, Wind, and Fire illuminate the Nile

Pharoah Sanders slides and glides his saxophone doing
molasses tai chi yoga between alto bars
while percussion waterfalls tinkle around and through him

Kurt Elling and Cecile Savant scat, snap, sing through the currents of Branford
Dr. Lonnie Smith sails up and down the Hudson on his mighty ship
Hammond B3, turbaned teeth twinkling through tuneful waters,
bass bouncing off and under his bright notes

Arturo O'Farrill unapologeticaaly plays " FUCK TRUMP" to let us know
Hispanics won't stand for it - NO!!

Round white frames on Cecile's round black head as round rich tunes
emerge from her sweet red lips and the ringdingding of her trolley
transports us to Afro Paris from Judy Garland's white St. Louis

A sea of humanity flows up and down these rivers of sound
Diving into the waters of Pharrell, Esperanza,Kurt
Pulsing to the waves of the Roots
Blending into streams of Heinekin, wine, Moscow Mules, mojitos
Fueled by herring, fruit, curry, tapas, barbeque, satay, sushi
Throbbing to the dj beats in Tigris
Thrumming to jazzy Columbian harp strings
Internal beats joining your heart, your blood pulsing in the Great River
That is North Sea Jazz
That is the music that joins us
That is this sea of humanity
That flows into and out of AHOY ROTTERDAM
The rivers to the sea of life
That join us despite bombs, bullets, planes
The music flows over and through it all pulsing
LIFE LIFE LIFE

Book Review

Lightening After the Echo

Jill Charles, Chicago, USA

How much of your inner life can you share with another person? You can describe your feelings in words and relate your experiences of the place you live in, the people you love, the seasons that bring changes in your life. But how much does understanding depend on the listener?

The poems in Lightening after the Echo by Viola Lee reach out to readers with questions about how we understand each other and some answers about finding meaning in everyday places and interactions.

The theme of nature runs through many of the poems, with weather, animals and plants. The paperback poetry collection comes with small white cards with orange sketches of native Midwestern flowers and grasses. Handmade by Bill Ripley, publisher at Another New Calligraphy press, the cards serve as evocative illustrations and useful bookmarks for these verses.

Some poems are specifically rooted in Viola Lee's hometown, Chicago. *City of Neighborhoods* reads like a love letter to Chicago and the tale of her parents emigrating from Korea and meeting there, "No better skyline/ my father will often hesitate and say in his broken English." *City of Work, City of Mud, Oil, Snow* realistically reveals Chicagoans' perseverance in fierce winters and long days of labor, "born of these words that just keep going/ boots covered in snow and oil/ always this snow and oil, but we just keep going." Other poems discuss worldwide issues such as human rights abuses in *The Torture, "*After the news/ described the torture/ a neighbor next door/ thought it was key/ to walk around a garden/ for a long while."

Lee's poems range from wryly comical in *So Tell Me about Yourself?* "I will never be a lover/ No one will call me cupcake" to starkly sad in *Not in this Life, "*Learning how to write a poem is the hardest still/ especially when using that metaphor/ of riding your bike/ that night in the rain / even with the heartbroken" but all of these emotions are honest and relatable.

Love of every kind appears here, from grief for a friend's suicide in *Outside Now [Poem for Brian L.]* "I tore myself up. The only image/ is of your room/ and you. Outside now" to the enduring love of parents, grandparents and children in *Parkinson's and the Body*, "You will learn that the things/ we do as a family consist of calming the nerve".

Fourteen of the 46 poems in Lightening after the Echo have "Conversations"in their titles. The conversations attempt to cross boundaries with empathy or decide to respect solitude and independence. *Conversation with the Breaking* confronts the limits of life and time,"What will break will always break: this, this distance, this country, this shifting, this, you, this, me." *Conversation of the Wood* embraces wildness, "Let us all walk in single file now/ to what we are all becoming./ Branch over branch, this is how it looked./ The wild was like hair and tobacco."

The longing for connection and recognition is strongest in *Particles* with the chapbook's title line, "You are a basil plant and lightening after the echo/ You are the writing of an obituary of someone who is finally getting recognized… you will come back in another form./ Wait for me. Wait for me."

Lightening After the Echo leaves readers with an impulse to speak up about what matters most, to connect with those we love and to honestly contemplate our own hearts.

Lightening After the Echo is published by Another New Calligraphy press and is available for purchase at www.anothernewcalligraphy.com. Another New Calligraphy produces books of poetry and music CDs from Chicago artists.

Annual Great Southern Festivalgoer and Wine Lover

Erin Nichols, Perth, Australia

The Great Southern Region of Western Australia

Western Australia may only have one big city, but it more than makes up for this with its breathtaking scenery, rugged coastlines and amazing food and wine. The southern part of Western Australia is a relatively little known tourism destination but boasts world class wineries, picturesque seaside towns, national parks, mountain ranges and a dramatic coastline that can't be beat. The cold climate can be brisk in winter but all the more reason to explore this lovely area by day then curl up next to a roaring fire in one of the local B&Bs. Summer in the south is a refreshing change from the hotter temperatures of the city, and if you are into hiking and outdoor pursuits, this is a perfect time to do this.

10 Things to Do When Visiting the South:

1. Take a whale watching cruise in Albany and explore the coastline by boat.
2. Go on a wine tour through the Porongurups and Denmark region and taste award winning cool climate wines.
3. Have a fresh coffee and cake in the little cafes in the pretty town of Denmark.
4. Hike up Bluff Knoll, one of Western Australia's highest mountain peaks.
5. Go to the Gap and the Natural Bridge lookouts to see amazing granite cliffs and turquoise seas.

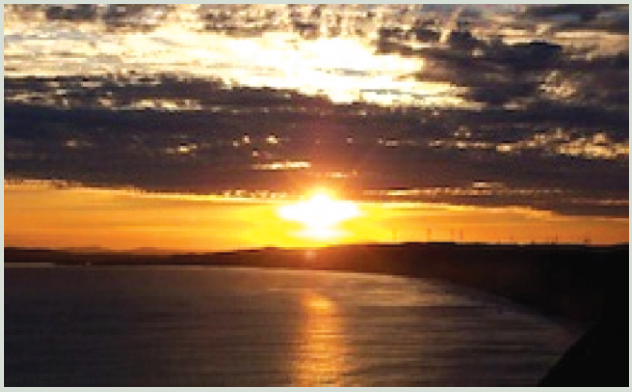

6. Feast on an abundance of fresh fish and seafood caught and eaten on the same day in one of the local restaurants in Albany. Even better, take a chartered fishing boat and catch your own!
7. Stroll along white sandy beaches with blue waters where you can literally be the only person there.
8. Go to the Albany Boatshed Market on a Sunday to sample local produce such as honey, blueberries, cheese and fresh fruit and vegetables from paddock to plate.
9. Go diving or snorkelling in Bremer Bay to glimpse a rare sea dragon.
10. Find out about the Great Southern's

flourishing agriculture including sheep and wheat farming from the locals in Kojonup.

The Great Southern Wine Festival 2016

There is a local festival that occurs every year, nestled in the foothills of the Porongurup Mountain Range in the spectacular countryside of the Great Southern region.

Held over the long weekend in March (4-6), The Great Southern Food and Wine Festival hosts food and wine from Albany, Denmark, Frankland River, Mt Barker and the Porongurups.

Festival Highlights:

All day local bands and entertainment:

Audiences were treated to acrobatic demonstrations and local bands belting out an eclectic mix of rock, country and blues. This happy atmosphere provided a great venue for little kids (and slightly bigger kids) to let their hair down and have a dance.

Cooking demonstrations and competitions such as the One Wok Wonder cook-off:

For kids and adults alike, the One Wok Wonder cook-off allowed competitors to show their skills in the kitchen. Competitors had to use three locally produced ingredients pork, haloumi and avocado and after 30 minutes cooking time, produced interesting and innovative dishes to be judged by professional chef, Ricki Caspi.

Degustation and Guided Wine and Cheese Tastings with a Sommelier:

For the more discerning festivalgoer, the chance to sample top quality local food and wine together was a delight. Sommelier Dan Wegener showcased local Chardonnays, Riesling and Pinot Noir with their food accompaniments in Master classes held at local wineries across the weekend.

The Great Grape Stomp:

Festivalgoers were invited to take off their shoes and stomp in some grapes to participate in how wine was traditionally made in days gone by. Kids really got into the spirit, got covered in juice, and particularly enjoyed the stomp.

And all the wine tasting that you can possibly desire:

Last but not least the wine tasting. 10 local wineries put forth their best offerings for people to sample and enjoy. The wine produced in the Great Southern region is like the diverse countryside: rich, surprising, spectacular and unlike anything you will get in other parts of Australia. Specialties of this region include Riesling, Pinot Noir, Sauvignon Blanc, Shiraz and Cabernet Sauvignon. Recent years have also seen an increase of Malbec and Chardonnay.

White wines were delicate, but full of wonderful flavours with strong tones of melon, citrus and floral notes. The cool climate gives Rieslings of this area a freshness and clean finish to the palate.

Authors' choice of White Wine 2016:

Castle Rock 2013 Skywalk Riesling

Red wines were a treat to discover. Flavours were bold and strident, however also contained a huge range of flavours such as pepper, blackberry, plum mulberry and liquorice. A glass of Shiraz packed in enough flavour and layers to make you believe that you were both drinking wine and eating a meal all in one.

Authors' choice of Red Wine 2016:

Dukes' Single Vineyard 2013 Shiraz

For the person who enjoys a sweeter wine, Rose, Port and Muscat were rich, fruity and made you think you were eating a Christmas pudding! Bubbly, pink and sweet Moscato was effervescent and just plain yummy!

Authors' choice of Sweet & Bubbly 2016:

Mount Trio Moscato and Jingalla Silver Jubilee Muscat.

So, if you are thinking of a weekend away from the city and want to be surrounded by pristine countryside, warm and welcoming people and truly

outstanding local wine and food, the Great Southern Wine Festival should not be missed.

Participating Wineries:

Abbey Creek Vineyard. Castle Rock Estate. Duke's Vineyard. Ironwood Estate .Jingalla Wines. Montefalco Winery. Mt Trio Vineyard. Shephard's Hut .Springview's Wines. Zarepath Wines.

‘‘কে যেন আবীর ছড়িয়ে দিল ভোরেরও আকাশে
লতায় পাতায় ঘিরি শিহরণ লাগে
তন্দ্রা জড়ানো চোখে পৃথিবী জাগে’’

‘‘ওই শেফালির শাখে কি বলিয়া ডাকে বিহগ বিহগী কি যে গায়’’